Vol. 49 | No. 1 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আহমদ ছফার উপন্যাসে সমাজ ও রাজনীতি

Volume	49
Issue	1
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Momenur Rasul
Published online	October 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v49i1.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i1.10
Pages	171-197
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আহমদ ছফার উপন্যাসে সমাজ ও রাজনীতি

Check for updates

মোমেনুর রসুল*

ব্যক্তিক জীবনের অন্তঃস্থ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রবণতাগুচ্ছ, যেমন — আবেগ-উদ্দীপনা-সংবেদনা-বিষাদ এবং তার সমান্তরালবর্তী সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের নানান অঘটন ও ঘটনাকে উপজীব্য করে দীর্ঘদিনব্যাপী খানিকটা ব্যতিক্রমী ধারার গ্রন্থ রচনা করে সর্বমহলে যিনি প্রশংসিত ও সমালোচিত হয়েছেন, তিনি তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী একজন সৃষ্টিশীল লেখক আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১)। ষাটের দশকের মধ্যবর্তী পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব এক উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। দেশ ও জাতির কাছে দায়বদ্ধ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আহমদ ছফা রচনা করেছেন অনেক কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, অনুবাদ, গান প্রভৃতি। শিল্প-সাহিত্যের সকল শাখায় স্বচ্ছন্দ বিচরণ সত্ত্বেও কথাসাহিত্যে বিশেষত উপন্যাস রচনায় তাঁর সাফল্য প্রশ্নাতীত। বলা যেতে পারে মননে-মেধায় শিল্পিত স্বভাবে তাঁর উপন্যাসসমূহ স্বকীয়তামণ্ডিত।

আহমদ ছফা তাঁর স্বকাল ও স্বসমাজকে উপন্যাসের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রত্যয়দীপ্ত অভিব্যক্তিতে তিনি বাঙালির আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা, শোষণ, সংগ্রাম ও রাজনীতির বহিঃস্রোতকে ব্যক্তির অন্তর্জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করে উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। মূলত তাঁর উপন্যাসের পটভূমি বৃহৎ সময় পরিসরে বিধৃত। ১৯৪৭-এর দেশভাগ, পরবর্তী সামরিক শাসন, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের অবস্থা এবং গণতান্ত্রিক শাসনামলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক চিত্র গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর উপন্যাসসমূহে। ইতিহাসের এই সময়কে তিনি ধারণ করেছেন বৈচিত্র্যময় বিষয়ের অনুষঙ্গে। মূলত সংকটময় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জীবনের জটিলতা অন্বিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে। ফলে তাঁর উপন্যাসে সমাজ ও রাজনীতি এক অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাঁর সাতটি উপন্যাসে প্রতিফলিত সমাজ ও রাজনীতির স্বরূপ সন্ধানে সচেষ্ট হব। এগুলো হচ্ছে :

১। *সূর্য তুমি সাথী* (রচনা ১৯৬৪-১৯৬৫, প্রকাশ ১৯৬৭)

২। *ওঙ্কার* (রচনা ১৯৭২, প্রকাশ ১৯৭৫)

৩। *একজন আলি কেনানের উত্থান পতন* (রচনা ১৯৮৮, প্রকাশ ১৯৮৮)

৪। *মরণ বিলাস* (রচনা ১৯৮৮, প্রকাশ ১৯৮৯)

৫। *অলাতচক্র* (রচনা ১৯৮৪, প্রকাশ ১৯৯৩)

৬। *গাভী বিত্তান্ত* (রচনা ১৯৯৪, প্রকাশ ১৯৯৫)

৭। *অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী* (রচনা ১৯৯৫, প্রকাশ ১৯৯৬)

---

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৪৭-এ দেশভাগের পর সদ্য স্বাধীন বাঙালি মুসলমান স্বদেশকে নিয়ে অনেক আশা ও স্বপ্নে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৮ সালের মধ্যেই বাঙালি অনুভব করল তাদের সংকট। পাকিস্তানি বৃহৎ বেনিয়া-পুঁজিবাদীরা অতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করল পূর্ব বাংলার উৎপাদন যন্ত্র ও রাষ্ট্রক্ষমতার ওপর। দেশীয় সামন্ত শাসন ও পাকিস্তানি বেনিয়াদের শোষণে পূর্ব বাংলা গড়ে উঠল আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্তবাদী সমাজরূপে। পূর্ব বাংলার সমাজ বিকাশের পথ হলো অবরুদ্ধ। মানবতাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণি ১৯৪৮-এ প্রতিবাদ করল এ অবস্থার বিরুদ্ধে। ১৯৫২ সালে ভাষার দাবিতে রক্তদানের পরও মূলত সে প্রতিবাদ পুরোপুরি সার্থক হল না। কেননা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিকদের মননে যে প্রগতি চেতনার জন্ম দিয়েছিল, ১৯৫৮ সালের আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের ফলে তা স্তব্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭০ কালপরিসরে বাঙালির ওপর পাকিস্তানি শাসকের অত্যাচারের মাত্রা কমেনি, বরং বেড়েছিল। এ সময়ে সাহিত্যিকদের সামনে ছিল বন্দিমুহূর্ত, অলঙ্ঘ্য দেয়াল, জটিলতম সমাজ গঠন এবং অবরুদ্ধ সমাজ চেতনা। সামরিক শাসনের ভয়কে অতিক্রম করেও কিছু সংখ্যক ব্যতিক্রমী লেখক প্রগতিশীল সমাজ-ভাবনা ও সমকালস্পর্শী সাহিত্য রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। অপরদিকে ১৯৭১-পরবর্তী আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সমগ্র জাতিকে করেছে হতাশাচ্ছন্ন। দীর্ঘ তেইশ বছর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট সমাধানের যে পথ প্রশস্ত হয়েছিল, পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ের স্বার্থান্বেষী সেনাতন্ত্র এ দেশীয় জাতিসত্তাকে পুনরায় নিক্ষেপ করে আত্মপরিচয়হীনতার যন্ত্রণায়। দীর্ঘ নয় বছরের স্বৈরাচারী শাসনের পতন ঘটাতে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এভাবেই বাঙালির জাতীয় জীবনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। বাঙালির সমাজ ও রাজনীতির এই সামগ্রিক রূপকে আহমদ ছফা তাঁর উপন্যাসসমূহে তুলে ধরার কৃতিত্বে, নিরীক্ষায় এবং দুঃসাহসে প্রাতিস্বিক মাত্রা অর্জন করেছেন। সমালোচকের মতে :

> আহমদ ছফা সমকালের রাজনীতি-অর্থনীতি-ধর্মনীতি এবং সমাজনীতি অনুশাসিত জীবনকে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তুলে ধরেন। জীবনের নির্মম রূপ ও জীবনের অন্তর্গত একবিন্দু ভালোবাসা — আহমদ ছফা দুটিকেই তুলে ধরেছেন। কিন্তু নির্ভুল বিদ্রূপের কশাঘাত করেছেন সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে।[১]

সূর্য তুমি সাথী

কথাশিল্পী হিসেবে আহমদ ছফার যাত্রারম্ভ *সূর্য তুমি সাথী* উপন্যাসের মাধ্যমে। উপন্যাসটি তিনি রচনা করেন মাত্র একুশ বছর বয়সে। উপন্যাস রচনায় হাতেখড়ি প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন :

> প্রথম উপন্যাসটি আমি লিখেছি বাজী ধরে 'সূর্য তুমি সাথী'। যখন মানিকের উপন্যাস আমরা পড়লাম 'পদ্মা নদীর মাঝি,' 'পুতুল নাচের ইতিকথা' — আমি তখন ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে, তখন আমার দাড়ি গোঁফ ওঠেনি। তো, যখন লিখাটা লিখলাম তখন বাজী হলো যদি লেখাটা 'সংবাদ' এ-ছাপতে পারি একশো টাকা দেবে আমার বন্ধু জামাল খান।[২]

বাজি ধরে লিখলেও এ উপন্যাসেই আহমদ ছফার শিল্পী-মানসের যথার্থ প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। তাঁর সাহিত্য জগতে অনুপ্রবেশের কারণ ছিল 'সোসাইটিকে সার্ভ করা'।[৩] *সূর্য তুমি সাথী* উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসেবে যে গ্রামকে লেখক ব্যবহার করেছেন তা তাঁর পরিচিত হলেও এ গ্রামই মূলত সারা বাংলাদেশের প্রতীকে পরিণত। এ উপন্যাসের কাহিনী সম্পর্কে ছফা নিজেই বলেছেন :

> এটার কাহিনীগুলো প্রায় আমাদের পরিবারের সংলগ্ন কাহিনী। ... এখানে এক খলু মাতব্বর আছে। যে মারা গেলো একশত বিশ বছর বয়সে ক'দিন আগে, সে আমার খালাতো বোনের জামাই।[৪]

ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসের বিষয় হিসেবে হিন্দু ও মুসলিম অধ্যুষিত বরগুইনি পাড়ের পাশাপাশি দুটো গ্রাম গাছবাড়িয়া-সাতবাড়িয়া অঞ্চলের সাম্প্রদায়িকতা, গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ও মাতব্বর শ্রেণির অন্যায় দাপটে সাধারণ মানুষের করুণ জীবনের আলেখ্য নির্মাণ করেছেন। 'বিশেষ ভৌগোলিক কাঠামোর জীবন সমগ্রতা উন্মোচনের প্রয়োজনে তিনি একাধিক চরিত্রের অন্তর-বাহিরকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছেন।'[৫] উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র দরিদ্র হাসিম বৈশাখের তপ্ত রোদে লাকড়ি কেটে চার মাইল পথ হেঁটে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে পুকুরপাড়ের পাশেই হঠাৎ দেখতে পায় 'হাতির মতো বলবান তেলিপাড়ার তেজেন দাকে'।[৬] সমগ্র পৃথিবীর ওপর অভিমানে আত্মহত্যায় সক্রিয় তেজেন সম্পর্কে ছতুর বাপের মন্তব্য :

> আত্মহত্যা মহাপাপ। কাফের এনে তো যাইত দোযখত। এক্কই কথা। ফি নারে জাহান্নামে হালেদিনা। (কাফের এমনিতেও নরকে যেত, একই কথা, তার জাহান্নাম নরকে স্থান।)[৭]

কোনো হিন্দু মৃত্যুবরণ করলে তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবার অনুরোধ করাটাই বিধি, এ বক্তব্যের মাধ্যমে উপন্যাসে গ্রামীণ মানুষের সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

আহমদ ছফা দেখেছেন যে, ১৯৪৭ সালে যে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়েছিল, সে আগুন দেশভাগের পরও নিভে যায়নি। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে সৃষ্ট হিন্দু-মুসলিম বিরোধ গ্রাম বাংলার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছিল ব্যাপকভাবে। ফলে এ বিষবাষ্পকে দীর্ঘদিন বহন করতে হয়েছে বাংলার সাধারণ জনজীবনকে। হাসিমের বাবা ধর্মান্তরিত হয়েছিল বলেই হিন্দুসমাজ হাসিমকে যেমন সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি, তেমনি মুসলিম সমাজেও ছিল না তার সম্মানজনক স্থান। পিতা হরিমোহনের মুসলমান হওয়ার ঘটনাকে অবলম্বন করে গ্রামের হিন্দু-মুসলিম ভেদ আরো প্রকট হয়ে ওঠে। হরিমোহন যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তখন দশ গ্রামের মুসলমান তাকে কেন্দ্র করে উৎসবে মেতে ওঠে, হিন্দু ধর্মের অসারতা নিয়ে বক্তৃতা দেয়, গরু জবাই করে জেয়াফত দেয় — এই চিত্র মুসলিম ধর্মান্ধতাকে প্রমাণ করে। অপরদিকে হিন্দুর পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেছেন :

> তার পরিচয় মুসলমানের কাছে বান্যার পুত, হিন্দুদের কাছে কী তা জানার অবকাশ হয়নি। কারণ তারাও নৃশংস কম নয়।[৮]

সংকীর্ণ ধর্মচিন্তা মানুষকে কতটা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা লেখক স্পষ্ট করে তুলেছেন উপন্যাসে। প্রসঙ্গক্রমে, সাতচল্লিশের দেশভাগের ঘটনাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে উপন্যাসে। কৃষক সমিতিতে কাজ করতে গিয়ে হাসিম এক বুড়ির দেখা পায়, সে বুড়ি দেশভাগের পর একমাত্র সন্তান সঙ্গে নিয়ে এদেশে চলে আসে। বুড়ির কথা থেকেই দেশ ভাগের সময়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

> 'জাগা-জমিন ছাড়ি আইলা ক্যা?' (জায়গা-জমি ছেড়ে এলে কেন?)
> 'ডরে, বাপজান, ডরে।'
> 'কার ডরে?'
> 'জান না বাজান, হিন্দুদের ডরে।'
> 'এই দেশত ত ব্যারামের আর অভাবে মরণের দশা অইয়ে'। (এই দেশেও তো রোগে আর অভাবে মরণের অবস্থা হয়েছে।)
> 'বাপজান, মরণের কী ভয়?'
> 'ভয় কারে?'
> 'ভয় ত হিন্দুদের'।[৯]

এই ধর্মীয় অনুদারতা ও আন্তঃমানবিক সম্পর্কহীনতা লেখকের মর্মমূলে দাগ কেটেছিল। রক্ত-মাংসে তৈরি সব মানুষ, তবুও ধর্মের ঘেরাটোপে বন্দি তারা। এই বন্দিত্ব থেকে মুক্তি সম্ভব তখনই যখন মানুষের মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটে। মানুষে মানুষে ভেদ ছফাকে দারুনভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই মনমোহনের ছোট্ট ছেলে শোভনের প্রশ্নের মাঝে ব্যক্তি আহমদ ছফাকে আমরা খুঁজে পাই — 'আইচ্ছা মা, সব মানুষ এক মানুষ নয় ক্যা?'[১০] এ প্রশ্ন যেন কেবল শিশু শোভনের নয়, এ প্রশ্ন সমগ্র মানব জাতির।

সম্প্রদায়গত আচরণ ও অন্তরঙ্গতাগত দূরত্বই নয়, গ্রামীণ উচ্চবিত্ত জমিদার-মাতব্বর শ্রেণির সঙ্গে সাধারণ মানুষ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অতলান্ত ব্যবধানও এ উপন্যাসে চিত্রিত। হাসিম, তেজেন, হরিমোহন, ছতুর মা, কবীরের বাপ দারিদ্র্যসীমার প্রান্তরেখায় বসবাস করলেও তাদের প্রতি ধনীরা সাহায্যের হাত প্রসারিত করে না। এদের অভাব, নির্যাতন, উপবাস লেখকের অন্তরকে ব্যথিত করে। তাই তেলিপাড়ার তেজেনের মৃত্যুকে লেখক পাপ হিসেবে দেখেন না, বরং তেজেনের বিষণ্ন দুই চোখের জিজ্ঞাসার মাধ্যমে যেন সমগ্র বাংলাদেশের নির্যাতন আর নিপীড়নকেই তুলে ধরেন।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আহমদ ছফার ব্যক্তিগত জীবন-অভিজ্ঞতার ছায়া পড়েছে এ উপন্যাসে। তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে, 'এ উপন্যাসে কমিউনিস্ট আন্দোলনের গন্ধ রয়েছে।'[১১] গ্রামে ওলাওঠা মহামারি আকার ধারণ করলে কৃষক সমিতির তৎপরতার কথা জানা যায়। গ্রামীণ অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায় কৃষক সমিতির নেতা মনির আহমদ, সুধাংশুবাবু। আন্দোলনকারীরা 'লাঙল যার জমি তার' ঘোষণা করে বাঁচার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। হাসিম এ কৃষক সমিতিতে যোগ দিয়েই বুঝতে পারে যে, তার নিজেরও একটি পরিচয় আছে। মহামারিতে কৃষক সমিতির পাশে থেকে কাজ করতে গিয়েই হাসিম অনুধাবন করতে পারে যে, হিমাংশু, মনির আহমদের মতো পৃথিবীতে এখনো এমন মানুষ আছে যারা বিত্তবানদের দিকে তাকায় না, মানুষকে মানুষ বলে গ্রহণ

করে। হাসিমের উপলব্ধিতে লেখকের নিজস্ব বিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় :

> এক সময় নাকি সমাজের সকলে সমান ছিল। সকলে সমানভাবে স্বাধীন ছিল। দাস ছিল না কেউ কারো। সকলে সমানভাবে পরিশ্রম করত, সমানভাবে ফলভোগ করত। কেউ বড় কেউ ছোট ছিল না। মানুষ মানুষের মেহনত চুরি করে মানুষকে দাস বানিয়ে রেখেছে। কৃষক-শ্রমিকের বুকের তাজা রক্ত তাদের বাগানে লাল লাল গোলাপ হয়ে ফোটে। সহস্র রকম পদ্ধতিতে বুকের রক্ত শুষে নিচ্ছে। হাসিম যেন চোখের সামনে শোষণের নলগুলো দেখতে পেল। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এ শোষণের পথ বন্ধ করতে হবে। পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিকের শ্রম চুরি করে ধনীরা বালাখানা গড়েছে।[১২]

পুঁজিপতি ও সামন্তপ্রভুরা মানুষকে শোষণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। ফলে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে শ্রেণিবৈষম্য, ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে আর বিত্তহীনরা হচ্ছে দরিদ্রতর। তাই হাসিমের দুঃখ তার একার নয়, সামষ্টিক সূত্রে তা গ্রথিত। হাসিম বুঝেছে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে কিংবা রাধামাধবকে ডেকে তাদের দুঃখের অবসান হবে না। তাই সে বলে :

> চাচা রাখি দাও তোঁয়ার রাধামাধব। বেবেক দুনিয়াভরা শোষণ, শোষণে রক্ত নাই, হাড্ডিতে ঠেকাইয়ে আনি। এত শোষণ তবুও মাইনষের ঘুম ন ভাঙ্গে ক্যা? [১৩]

হাসিম বুঝতে পারে, বাঁচতে হলে প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা। সমবেত প্রচেষ্টাতেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার শিক্ষা সে পেয়েছিল কৃষক সমিতি থেকে। ওলাওঠা মাহামারিতে কাজ করতে গিয়ে হাসিম দেখেছে তাবিজ-কবচে বিশ্বাস করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজের জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। প্রতিষেধক টিকা নিতে তারা ভয় পায়, কারণ মোল্লারা বলেছে টিকা নিলে জাত যাবে, ধর্ম যাবে। মানুষের ধর্মানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে ধনী সম্প্রদায়ের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা ভণ্ড মোল্লারা গ্রামীণ জীবনকে আরো বিপর্যস্ত করে তোলে। তাই হাসিমের মনে হয় 'ওরা হিন্দু নয়, ওরা মুসলমান নয়, ওরা একজাত অত্যাচারী'।[১৪] হাসিম কৃষক সমিতির সাথে কাজ করে, গ্রামে ফেরার পথে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে পথের মানুষ, কেউ বা বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে বলে :

> অকুলীন কুলীন অইব কুলীন অইব হীন
> অকুলীনে দুঁড়াইব ঘোড়া কুলীনে ধরিব জিন।[১৫]

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর এ অবজ্ঞা হাসিমকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে না। কারণ, সে বুঝতে পেরেছে যে এদেশের দরিদ্র শ্রেণি স্বাধীনভাবে কাজ করা তো দূরে থাক, কোনো সুস্থ চিন্তাও করতে পারে না। শুধু জাহেদ বকসুর হুকুম মানা আর খলু মাতব্বরের দাঙ্গায় অংশ নিতেই তারা অভ্যস্ত। সমাজের নিয়মের শেকলে বাঁধা পড়ে আছে তারা, এ শেকল ছিন্ন করার সামর্থ্য তাদের নেই। মানুষের হিংসাবৃত্তি থেকে উদগীর্ণ হয় যে অন্ধকার কিংবা ধর্ম-সমাজ-অর্থনীতির জীর্ণ ও স্থবির অন্তর্লোক থেকে উদ্ভব ঘটে যে অন্ধকারের, অপরাজেয় মানব-আত্মার অমলিন ভালোবাসা থেকে বিচ্ছুরিত আলো সেই অন্ধকারের বিস্তারকে প্রতিহত করে। আর তাই হাসিমের চরম দুর্দিনে তার পিতামহী সকল ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধকে উপেক্ষা করে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। মাতব্বরের সম্পদ লালসার যূপকাষ্ঠে

বলি হওয়া সম্ভ্রমহীন জোহরার অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে হৃদয়-ঐশ্বর্যের আলোকবর্তিকারূপে আবির্ভূত হয় হাসিম। অন্ধকার বিদূরিত করা সেই আলোর উদ্ভাসনের মধ্যে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে ঔপন্যাসিক একদিকে যেমন নিরবলম্ব গ্রামীণ মানুষের নগরযাত্রাকে অবধারিত দেখান, তেমনি অনিবার্য দেখান আলোর জয়যাত্রাকেও। আলোচ্য উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে আহমদ ছফা দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করতে সফল হয়েছেন। তাঁর সমাজ-ভাবনা ও রাজনীতি-চেতনার সার্থক সমন্বয় ঘটেছে *সূর্য তুমি সাথী* উপন্যাসে।

ওঙ্কার

আহমদ ছফার দ্বিতীয় উপন্যাস *ওঙ্কার* প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে, যদিও তা লিখিত হয়েছিল ১৯৭২ সালে।[১৬] উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত এ উপন্যাসে একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে ধারণ করেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসটি সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, 'একটা লেখা ক্লাসিক হিসেবে চিহ্নিত হবে বলে আমি মনে করি। তা হল ওঙ্কার।'[১৭] উত্তম পুরুষে বর্ণিত এ উপন্যাসে লেখক কয়েকটি প্রতীক চরিত্রের মাধ্যমে সমাজ ও যুগ পরিবর্তনকে ভাষারূপ দিয়েছেন, সেই সঙ্গে সমকালীন জীবনের পটভূমিকায় রাজনৈতিক জাগরণের আলেখ্য তুলে ধরেছেন এবং উনসত্তরের স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে দিয়েছেন প্রতীকরূপ। মূলত বিশ শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশকের ঘূর্ণাবর্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট *ওঙ্কার*-এ বিধৃত হয়েছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ঘটেছিল সচেতন বাঙালির মুক্তি আকাঙ্ক্ষার সুতীব্র প্রকাশ। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হলেও এই দ্বি-জাতিতত্ত্ব কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। জনগণের মুক্তির পথ যেমন প্রসারিত হয়নি, তেমনি সাম্প্রদায়িকতারও অবসান হয়নি। পূর্ব বাংলার জনগণ সহজেই অনুধাবন করতে পারল যে, পাকিস্তানিরা আসলে এক জাতি নয়, তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিও এক নয়। 'বাঙালিরা সম্পূর্ণ আলাদা একটি জাতিসত্তা অন্তত অবাঙালি পাকিস্তানিদের থেকে।'[১৮] পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী, আমলা ও পুঁজিপতি শ্রেণি শুরু থেকেই পূর্ব বাংলার রাষ্ট্র ক্ষমতা, অর্থনীতি এমনকি সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে যার প্রথম ক্ষেত্র হলো বাংলা ভাষা। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন পল্টনের জনসভায় 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' ঘোষণা দিলে তীব্র প্রতিবাদ করে এতদঞ্চলের জনগণ। ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্ররা মিছিল বের করলে পুলিশ গুলি করে। 'অনেক মানুষ আহত হয় এবং নিহত হয় রফিক, জব্বার ও বরকত।'[১৯] ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হলেও যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতা না দেওয়ার জন্য সরকার নানা রকম ষড়যন্ত্র করতে থাকে। 'অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করা হয়।'[২০] ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার তথা প্রত্যক্ষ নির্বাচন, সার্বজনীন ভোটাধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার দাবিতে ছাত্রসমাজ আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়। '১৯৬৬ সালে শেখ

মুজিবুর রহমান প্রণীত ছয় দফা পেশ করলে তা বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে।'[২১] ৮ জানুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে আইয়ুব শাসনের অপসারণ ও মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য সম্মিলিত বিরোধী দল 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। দেশব্যাপী গণআন্দোলনের এ কর্মসূচি পালনের সময় ছাত্রসমাজের ওপর পুলিশি অত্যাচার শুরু হয়। এ নির্যাতনের প্রতিবাদ করে মিছিল বের করে ছাত্র-জনতা। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ছাত্র-জনতার এক মিছিলে পুলিশ গুলি বর্ষণ করলে আসাদুজ্জামান নামে একজন ছাত্রনেতা নিহত হন। শহীদ আসাদের গায়েবানা জানাজা শেষে লক্ষ লক্ষ জনতার বিশাল মিছিল আইয়ুব খানের পতনের স্লোগান তুলে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। আন্দোলন ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করে। ২৪ জানুয়ারি এ আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। 'অবশেষে ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন।'[২২]

১৯৬৯-এর পূর্ববর্তী সময়ে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করে রচিত এ উপন্যাসের একদিকে রয়েছে নায়কের পারিবারিক জীবনের কাহিনী, অন্যদিকে দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন ও গণজাগরণের চিত্র। উপন্যাসের কথক তথা নায়কের পিতা পূর্বপুরুষের প্রাপ্ত সম্পত্তি ও বংশ মর্যাদার কারণে অহংকারী ও আভিজাত্য বোধসম্পন্ন মানুষ। মিথ্যা খুনের মামলায় জড়িয়ে আড়াই হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করে রক্ষা পেলেও আবু নসর মোক্তারের সঙ্গে মামলায় জড়িয়ে নিঃস্ব হয়ে যান। আমরা দেখি যে, একদিকে সামন্ত সমাজে ভাঙন ধরেছে, অন্যদিকে দেশে বিরাজ করছে অরাজকতা। তাই বৃদ্ধের প্রাচীনপন্থী অহংবোধ ধুলায় লুটিয়ে পড়েছে আর মোক্তার শ্রেণি স্বার্থ রক্ষায় পাকিস্তানি শাসকের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বিলাসিতা আর চাকচিক্যের চমকে অন্ধ এ শ্রেণির মানুষ নীতি বা আদর্শের পরোয়া করে না, স্বার্থের জন্য নিচে নামতেও তাদের কষ্ট হয় না। যে মোক্তার কথকের বাবার সম্পত্তি-ভিটেবাড়ি পর্যন্ত হস্তগত করে ফেলেছিলেন, সেই মোক্তারই কথকের সঙ্গে তার বোবা মেয়ের বিয়ের কথা বলেন।

ওঙ্কার উপন্যাসে শাহরিক জীবনের পটভূমিতে বাংলার গণআন্দোলনের চিত্র উপস্থাপিত। ষাটের দশকের উত্তাল সময়ে একদিকে জনগণ যখন ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তির জন্য বিদ্রোহ করেছে তখন এদেশেরই একটি স্বার্থপর গোষ্ঠী নিজের ভাগ্য পরিবর্তনে তৎপর থেকেছে। আইয়ুব খানের শাসনামলে নায়কের শ্বশুর তথা মোক্তার সাহেবের অবস্থার আরো পরিবর্তন ঘটে। শ্বশুরের ক্ষমতার সুবাদেই সরকারি চাকুরি জুটেছিল নায়কের ভাগ্যে। কিন্তু মানসিক শান্তি তার ছিল না। কারণ সবার মতো একটি স্বাভাবিক সুখী জীবনের প্রত্যাশা তারও ছিল। অফিসের সহকর্মী নৃপেনের মুখে সদ্য বিয়ে করা বধূর কথা বলার নানা ভঙ্গির প্রশংসা শুনে তার মনেও স্ত্রীর মুখে কথা শোনার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। সেই সঙ্গে মানসিক সংকটও তীব্র হয়ে ওঠে। যুগসচেতন এই নায়কের মনে জন্ম নেয় শ্বশুরের প্রতি ধিক্কার আর নিজের প্রতি করুণা। বিত্ত-বৈভব মানুষের মনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে না; তাই সরকারি চাকুরি, বাড়ি এসব পেয়েও তার জীবন তৃষ্ণা পূরণ হয় না, বোবা স্ত্রীর কথা বলতে না-পারা প্রতিনিয়ত তাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু এক সময় সে অনুভব করে স্ত্রীর মাঝেও রয়েছে কথা বলার তৃষ্ণা। বোবা নারীর প্রাণের বেদনা ঝরে পড়ে সে শব্দে। নিজের ভুল বুঝতে পারে নায়ক, স্ত্রীর সাথে সহজ-

সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার। সামাজিক জীবনে ব্যক্তির সংকট-সংঘাতের পাশাপাশি দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও গণজাগরণের চিত্রও আলোচ্য উপন্যাসে প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। ষাটের দশকে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের প্রচণ্ড দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল জনজীবন। সেই সঙ্গে স্বার্থান্ধ ও সুবিধাবাদী শ্রেণি আইয়ুবী শাসনের সহযোগী হয়ে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে নিজস্ব অবস্থানকে প্রবল করে তুলতে তৎপর হয়েছিল। নায়কের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে সে সময়ের উত্তাল দিনগুলোর ছবি :

> দেশে ত্বরিত গতিতে সময় পালটাচ্ছিল। পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখের খবর সংবাদপত্রের পাতায় কালো ফুলের মতো ফুটে থাকে। দেশে আইয়ুব খান সাহেব সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গেড়ে বসেছেন। সংবাদপত্রের ব্যানারে খান সাহেবের একজোড়া গোঁফ হুংকার দিয়ে জেগে থাকে। দেখতে না দেখতেই দেশের জীবন প্রবাহের মধ্যে খান সাহেবদের অপ্রতিহত প্রভাব প্রবল সামুদ্রিক তিমির মতো ছুটাছুটি করছিল।[২৩]

দেশের মানুষের জীবনযাপনের অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তার অভাব এতটা তীব্র হয়ে উঠেছিল যে তা মানুষের সহ্যের সীমাকে অতিক্রম করেছিল। শেষ পর্যন্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল সবার :

> যেখানে দেশের গভীর ব্যথা, মার্শাল সাহেবের গোমড়ামুখো সৈন্যরা সেখানেই কাঁটা বসানো বুট জুতোর লাথি মারে। প্রায় একযুগ ধরে লাথি খেয়ে ব্যথা জর্জর অংশ ডাঁটো হয়ে উঠেছে। এখন প্রতিবাদ করার জন্য মুখিয়ে উঠেছে। যন্ত্রণা, বেদনা এবং দুঃখের কারখানা থেকেই প্রতিরোধের শানানো আওয়াজ ফেটে পড়ছে। চন্দ্রকোটালের জোয়ারের জলের মতো বইছে মানুষ। বাংলাদেশের রাস্তাগুলো নদী হয়ে গেছে। তাদের চোখে আগুন, বুকে জ্বালা, কণ্ঠে আওয়াজ, হাতে লাঠি। রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরে স্লোগানের ধ্বনি বাংলাদেশের আকাশমণ্ডলের কোটি কোটি বর্শা ফলার মতো ঝিকিমিকি খেলা করে।[২৪]

দেশের এ অবস্থায় নায়ক পারতপক্ষে বহির্জগতে বিচরণ করে না, অফিস যাওয়ার পথে ডানে বায়ে তাকায় না। মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতীক এই নায়কের মনের বিকাশটাই এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে, নিজস্ব সত্তা কিংবা প্রতিবাদ করার মানসিকতাই তার তৈরি হয়নি। জানালা খুলে মিছিল দেখার সাহস পায় না সে। বরং তার চিন্তায় জাগ্রত থাকে যে, আইয়ুব খানের সিংহাসন 'ঝড়ে পাওয়া নায়ের মতো'[২৫] দুলতে থাকলে শ্বশুরের অবস্থাও দিনে দিনে খারাপ হয়ে যাবে। পত্রিকা পড়া ছেড়ে রাশিফলের পঞ্জিকা পড়ে আর যৌন রোগের বিজ্ঞাপন দেখেই তার সময় কাটে। অন্যদিকে মিছিলের শব্দ শুনে তার বোবা স্ত্রী উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। রাজপথের মিছিল বোবা স্ত্রীর কথা বলার আকুতিকে তীব্র করে তোলে। নায়কের কাছে বোবা স্ত্রীটিকে মিছিলকারীদের চর বলে মনে হয়। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলি চালানো হলে আসাদুজ্জামানের মৃত্যুর ঘটনাটি নায়কের জবানীতে লেখক তুলে ধরেছেন :

> হঠাৎ করে শহরে একটা তুলকালাম কাণ্ড হয় গেল। কোথায় পুলিশ নাকি আসাদ নামে কোনো এক ছাত্রকে গুলি করে মেরেছে। তার পরদিন থেকে গোটা শহরে অলক্ষুনে ব্যাপার একের পর এক ঘটে যেতে থাকে। যেদিকেই যাই, যেদিকেই তাকাই, দেখি মানুষের মিছিল। পুলিশ আসে, ক্ষিপ্ত মানুষের ওপর লাঠিচার্জ করে, কাঁদুনে গ্যাস ছুড়ে মারে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসা মানুষ আর ঘরে ফিরে যায় না।[২৬]

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে বাংলার আকাশ বাতাস যখন প্রকম্পিত, তখন মেয়েটির অন্তরেও সে-ছোঁয়া লাগে। বাবা আইয়ুব খানের অনুসারী, স্বামী দেশের অবস্থায় বিরক্ত, কিন্তু দেশের জনগণের আবেগ স্পর্শ করেছিল বোবা মেয়েটির প্রাণে। কথা বলার প্রচণ্ড আগ্রহে সে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখে, স্বামী বাধা দিলে তার পা কামড়ে দিয়ে ঘর-বাড়ির জিনিস ভেঙে তছনছ করে। দেশের জনগণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করতেই যেন তার এ তীব্র প্রতিবাদ। আসাদের মৃত্যুর দশ বারো দিন পর মিছিলকারীদের তীব্র গতিবেগ স্পর্শ করে সন্তানসম্ভবা বোবা মেয়েটিকে। এক সময় তার কণ্ঠ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসে 'বাঙলা' শব্দটি। মিছিলে শোনা বাংলাদেশের শব্দের 'বাঙলা' উচ্চারণ করতে গিয়ে মেয়েটির গলা ছিঁড়ে রক্ত আসে। লেখকের ভাষায় :

> আচানক বোবা বউ জানালাসমান লাফিয়ে 'বাঙলা' অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করল। তার মুখ দিয়ে গলগল রক্ত বেরিয়ে আসে। তারপর মেঝেয় সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে থাকে। ভেতরে কী একটা বোধ হয় ছিঁড়ে গেছে। আমি মেঝের ছোপ ছোপ টাটকা লাল রক্তের দিকে তাকাই, অচেতন বউটির দিকে তাকাই। মন ফুঁড়েই একটা প্রশ্ন জাগে — কোন রক্ত বেশি লাল। শহীদ আসাদের না আমার বোবা বউয়ের? [২৭]

আসলে *ওঙ্কার*-এ সচেতন দেশপ্রেমী মানুষের স্বদেশ চেতনার সমান্তরালে বোবা বউয়ের 'বাঙলা' উচ্চারণের মাধ্যমে প্রবল দেশপ্রেম প্রকাশের পাশাপাশি পাকিস্তানি শাসন ও শাসকের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রদর্শিত হয়েছে। 'ওঙ্কার-এ দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন ও গণজাগরণের চিত্র শুধু সমাজ-আলেখ্য হিসেবেই আসেনি।'[২৮] এখানে নায়কের বোবা স্ত্রীর কথা বলার তথা আত্মপ্রকাশের আকুতিতে সমগ্র বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ও বাকশক্তি অর্জনের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটেছে।

একজন আলি কেনানের উত্থান পতন

একজন আলি কেনানের উত্থান পতন উপন্যাসে উপস্থাপিত ঘটনার কালগত পরিধি ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৫ সাল। তবে আলি কেনানের জীবনের কাহিনী সূত্রে ১৯৬৯-পূর্ববর্তী সময়ের কথাও বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে। মাজারকেন্দ্রিক ধর্মব্যবসার পাশাপাশি ষাট ও সত্তরের দশকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট সুনিপুণভাবে বিন্যস্ত এ উপন্যাসে। আলি কেনানের অতীত জীবনের ঘটনাসূত্রে একটি বিশেষ সময়কে প্রকাশ করেছেন আহমদ ছফা। আইয়ুব খানের শাসনামলে বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পতনকে চিহ্নিত করা হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। উপন্যাসের শুরুতেই আলি কেনানকে ভিক্ষা করতে দেখা যায়। সময়টা তখন ১৯৬৯ সাল। এক বছর আগে গণ আন্দোলনের উত্থান পর্বে জনগণের রোষ থেকে গভর্নরকে রক্ষা করেছিল ভোলার তামাপুর গ্রামের আলি কেনান। জীবনে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে তখন থেকেই। এ মানুষটির জীবনের উত্থানের কাহিনী বলতে গিয়ে লেখক বাংলাদেশের পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে উপস্থাপন করেছেন। পাশাপাশি বাঙালির সামাজিক অবক্ষয় ও জীবন যাপনের কদাকার চিত্রও প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাসে। আলি কেনানের অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে তৎকালীন সরকারের ক্ষমতার দাপট আর অপব্যবহারের চিত্র আমরা দেখতে পাই। তার আত্মীয়-

স্বজনের প্রতাপ গ্রামে হাজার গুণ বেড়ে যায়। ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রীকে ধরে বিল দখল আর খাস জমির বন্দোবস্ত করে নেয় সে। লেখক কেনানের এই কর্মকাণ্ডকে উপমিত করেন এভাবে :

> প্রেসিডেন্ট আইয়ুব যেমন ইসলামাবাদে বসে পূর্ব পাকিস্তানের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন, আলি কেনানও তেমনি ঢাকার গভর্নর হাউসে বসে তামাপুকুর গ্রামের যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করত।[২৯]

এই সামান্য পিয়নের ক্ষমতার উৎস হিসেবে তৎকালীন সমাজব্যবস্থাই দায়ী। ঔপনিবেশিক শাসনকে প্রসারিত করতে এগিয়ে আসা একটি শ্রেণির স্বার্থচিন্তাই ছিল প্রধান। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে গভর্নর হাউস থেকে বিতাড়িত আলি কেনানকে রাস্তায় নামতে হয় ভাগ্যান্বেষণে। অসম্ভব ধূর্ত ও শঠ এই ব্যক্তির আত্মসম্মানবোধ প্রবল বলেই নিজ গ্রামে ফিরে যেতে পারে না সে, বরং ভাগ্য পরিবর্তনের নতুন পথ খুঁজে নেয়। ক্ষুধার তাড়নায়, বেঁচে থাকার অভিপ্রায়ে সদরঘাটে ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে তার নতুন জীবনের সূচনা ঘটে। কপর্দকহীন, অনাহারী হলেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন আলি কেনানের ভিক্ষাবৃত্তির ধরনটি আর সবার চেয়ে স্বতন্ত্র। 'দে তোর বাপরে একটা ট্যাহা'[৩০] — এ কথার আকস্মিক চমকে টাকা দিতে বাধ্য অনেকেই। ১৯৬৯ সময়পর্বে আধঘণ্টা মুখে ফেনা তুলে চিৎকার করে একটি সিকি পাওয়া যেখানে ভিখারির জন্য আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো সেখানে একটি টাকা প্রাপ্তি কেনানের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। কেননা তৎকালীন সমাজে অর্থনৈতিক সূচকের মান এতই নিম্নগামী হয়েছিল যে দু'মুঠো অন্ন প্রাপ্তির কোনো নিশ্চয়তা ছিল না।

এ উপন্যাসে মাজারকেন্দ্রিক ধর্মব্যবসার বস্তুনিষ্ঠ চিত্র পাওয়া যায়। আলি কেনান ক্রমশ ভিক্ষাবৃত্তির খোলস বদলে পীর দরবেশে রূপান্তরিত হয়। বুদ্ধি প্রয়োগ করে ফুলতলির একটি বাঁধানো কবরে লাল নিশান টানিয়ে লালসালু দিয়ে কবর ঢেকে দিয়ে নিজেও আজানুলম্বিত আলখাল্লা আর গলায় কাঠের মালা পড়ে পীর রূপে প্রতারণার নতুন কৌশল তৈরি করে জীবনে বেঁচে থাকার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। উল্লেখ্য, আলি কেনানের সঙ্গে আমরা সাদৃশ্য খুঁজে পাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৯২২-১৯৭১) *লালসালু* (১৯৪৮) উপন্যাসের মজিদ চরিত্রটির। 'বলা যায় লালসালুর যেখানে শেষ আলি কেনানের সেখানে শুরু এবং এর সঙ্গে জাতীয় সংস্কৃতিরও একটা যোগসূত্র স্থাপন করেছে উপন্যাসটি।'[৩১] মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে প্রতারণার ফাঁদ পেতে আলি কেনান ও মজিদ তাদের জীবনের পরিবর্তন ঘটায়। আলি কেনানের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতেই সে শিষ্য সংগ্রহ করেছে, মাজারে বিচরণ করেছে, গান গেয়েছে। তার মাজার প্রতিষ্ঠা, মাজার দখল আমাদের দেশের একান্ত বাস্তব চিত্র। এদেশের সাধারণ মানুষ বুর্জোয়া শ্রেণির দ্বারা কীভাবে শোষিত হচ্ছে, মাজার ব্যবসার চিত্র সেটাও প্রমাণ করে। দুর্বল চিত্তের মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে সম্বল করে যে অর্থ মাজারে আসছে তা চলে যাচ্ছে দেশের বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে। মাজার নিলামের ব্যবসায়ে মূলধন হারানোর আশঙ্কা নেই। তাই বুর্জোয়া শ্রেণি নিজ স্বার্থ সিদ্ধিতে তৎপর। ওরসের জন্য টাকা সংগ্রহের কৌশল হিসেবে কারো গাড়ি থামিয়ে চাঁদা আদায় করে, মহাজনের দোকান থেকে চাল সংগ্রহ করে। যদিও সংগৃহীত অর্থের বড়ো অংশই মদ, গাঁজা আর ব্লুফিল্মের পেছনেই চলে যায়, আর এসব হীন কর্মকাণ্ডের অন্তরালে সক্রিয় থাকে ক্ষমতাসীন

মহল। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং বাঙালির সমাজজীবনের বাস্তবতাকে অত্যন্ত সচেতনভাবে আহমদ ছফা উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন।

সমাজজীবনের নৈতিক অবক্ষয়, প্রতিহিংসা, পারস্পরিক সম্পর্কের চিত্র রয়েছে এ উপন্যাসে। আলি কেনান যখন ফুলতলির পুরনো কবরে নিজের প্রতিপত্তি স্থাপন করে তখন এলাকার উঠতি যুবকের চাঁদাবাজির প্রয়াস জানা যায়। এছাড়াও মানুষের নৈতিক অধঃপতন কতটা প্রকট রূপ ধারণ করেছে তার পরিচয় পাওয়া যায় বস্তিবাসী বিধবা ছমিরনের মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায়। আলি কেনানের সঙ্গে আশ্রিতা ছমিরনের দৈহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার চিত্র নৈতিক অবক্ষয়কেই প্রকাশ করে।

ব্যক্তি ও সমাজজীবনের পাশাপাশি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসকেও নিয়ে আসা হয়েছে বক্ষ্যমাণ উপন্যাসে। শুরুতেই আইয়ুবী শাসনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে আর শেষাংশে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তী বাস্তবতার চিত্র। সত্তর সালের মাঝামাঝি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আলি কেনান অনুধাবন করতে পারে 'বাইরের শৃঙ্খলার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।'[৩২] গণ্ডিবদ্ধ জীবনের বাইরের দিকে তখন চলছে রাজনৈতিকভাবে উত্তাল দিনের জোয়ার। বাংলাদেশের সমাজকাঠামোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছে সে-অবক্ষয়ের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে তৎপর এদেশের জনগণ :

> উনিশশো উনসত্তর সাল শেষ হয়েছে। সত্তর সালেরও মাঝামাঝি অতীত প্রায়। বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনটি ভীষণ বেগবান হয়ে উঠেছে। জয়বাংলা ধ্বনির একাধিপত্য গোটা দেশটিকে ঢেকে রেখেছে। সকালে জয়বাংলা, দুপুরে জয় বাংলা, সন্ধ্যেয় জয়বাংলা, এমনকি রাত্রির গভীর অন্ধকারে জয়বাংলা ধ্বনি কামানের গোলার মতো ফেটে পড়ে। যে-শিশুর মুখে সদ্য কথা ফুটতে আরম্ভ করেছে, মা-বাবা উচ্চারণ করার আগে জয়বাংলা শব্দ দিয়ে কথা বলা শুরু করে।[৩৩]

পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে আলি কেনান নিজেকে 'জয়বাংলার দরবেশ' বলে পরিচয় দেয়। জয়বাংলার ধ্বনির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার একটি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যও তার ছিল। যে গভর্নর সাহেবকে সে প্রাণে বাঁচিয়েছিল, সে গভর্নরই তাকে রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়েছিল। সেই দিনগুলোর কথা বলতে গিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যে, রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে, পোস্টার লাগিয়ে প্রতিবাদ করে জনগণ। আলি কেনানের আস্তানা জয়বাংলার আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠলেও ভণ্ড আলি কেনান বাস্তবিক অর্থে জয়বাংলাকে ভালোবাসে না বরং পরিস্থিতির চাপে পড়েই সে জয়বাংলার আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। স্রোতের অনুকূলে গা ভাসানো আলি কেনান উপলব্ধি করে :

> পাকিস্তানিরাই হল আসল মানুষ, আর বাঙালিরা সব চুতিয়া। কেউ তাকে বলে দেয়নি। কিন্তু এই ধারণাটি তার মনে জন্ম নিয়েছে। পরিস্থিতির চাপে নিজেকে জয়বাংলার দরবেশ ঘোষণা করেছে বটে, কিন্তু জয়বাংলার মানুষদের সঙ্গে সে অধিক দূরে যেতে চায় না।[৩৪]

সমাজসত্যের মর্মমূলে প্রবেশ করে লেখক দেখিয়েছেন যে, সুবিধাবাদী এ শ্রেণিটিই স্বাধীনতার পর এদেশের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিধূসরিত ও কলুষিত করতে এগিয়ে এসেছে। পঁচিশে মার্চ কালো রাতে ঢাকা নগরীর বুকে বন্দুক, ট্যাংক, কামান নিয়ে প্রচণ্ড

হিংস্রতায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের সময়ও কেনানের মনে দেশপ্রেম নয় বরং নিজ স্বার্থের কথাই মনে হয়েছিল : 'পাকিস্তানি সেনাবাহিনী — রাস্তায় মশাল জ্বালিয়ে একটা মানুষেরই খোঁজ করছে, তার নাম আলি কেনান।'[৩৫] চারদিন পর রাস্তায় বের হয়ে আলি কেনানের চোখে ধরা পড়েছে বিধ্বস্ত বাংলার চিত্র :

> বাড়ির ছাদে আর জয়বাংলার নিশান ওড়ে না। রাস্তায় মানুষজনের কোনো চিহ্ন নেই। কী ভূতুড়ে পরিবেশ। এখানে-ওখানে মানুষের লাশ পড়ে আছে। মিলিটারি আর সাঁজোয়া গাড়ি রাস্তায় টহল দিচ্ছে।[৩৬]

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ না থাকলেও যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানা যায় এ উপন্যাস থেকে। যুদ্ধশেষে ১৯৭২ সালে আলি কেনান নিমবাগানে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে সবাই বীরের সম্মান দেয়। সমাজজীবনে অসংগতি আর শাসনের চাপে পড়ে এদেশের মানুষের মনে সমাজভীতি, ধর্মভীতি এতটাই প্রবল হয়েছে যে, আলি কেনানের হঠাৎ গজিয়ে ওঠা মাজার সম্পর্কে কেউ কোনো কথা বলেনি, বরং স্বাধীনতার পর মাজারে সে ফিরে এলে তাকে সাদরে গ্রহণ করে এলাকাবাসী। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে দেশের সাময়িক উত্তেজনা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলার সঙ্গে যুক্ত হয় রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও সংঘাত। '১৯৭৩-৭৪ সালে বিশ্বতৈলসংকট, বিশ্ববাজারের অস্থিরতা এবং দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি সদ্য স্বাধীন দেশের অস্তিত্বমূলে আঘাত হানে।'[৩৭] সে-সময়ে মানুষের সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে গিয়েছে, সবকিছু ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, কিন্তু তাতে কিছুই আসে যায় না আলি কেনানের। কেননা যে কোনো পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিজ স্বার্থ উদ্ধারের পথ তার জানা আছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে মাইক ভাড়া করে জুম্মার নামাজের পরে ঘোষণা করে :

> এই বাংলাদেশে আমি আর শেখ মুজিব ছাড়া আর কুনু বাঘের বাইচ্চা নাই। শেখ সাহেবের কতা যেমন হগলে হুনছে, হেইরকম আমার কতাও হুনন লাগব। অনেক লোক জুটেছিল, কেউ আলি কেনানের বিরোধিতা করল না।[৩৮]

সদ্য স্বাধীন দেশে সবাই যেন রাজা। তাই অন্যের অন্যায়ের প্রতিবাদ করার চিন্তাও আসে না কারো মনে। ফলে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ঔপন্যাসিক সমাজ-বাস্তবতা ও রাজনীতি-চেতনার সার্থক সমন্বয় ঘটিয়েছেন আলোচ্য উপন্যাসে।

মরণ বিলাস

সমাজকাঠামোর অভ্যন্তরে ক্ষয়িষ্ণু নীতিবোধের পরিচয়বহ উপন্যাস *মরণ বিলাস*। মৃত্যু-শয্যাশায়ী মন্ত্রী ফজলে ইলাহির অতীত জীবনের নিষ্ঠুরতা আর এদেশীয় রাজনৈতিক বাস্তবতা ধারণ করেছেন লেখক উপন্যাসটিতে। এ উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে বাস্তব জীবনের ক্লেদময় রূপ। মন্ত্রী ফজলে ইলাহি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অতীত জীবনের স্মৃতিচারণ করেছেন মাওলা বক্স-এর কাছে। এই সূত্রেই বাংলাদেশের বুর্জোয়া-ধনতান্ত্রিক সমাজের নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা ও স্বার্থপরতার চিত্র উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। দুই ব্যক্তির

কথোপকথনে উপন্যাসটি গতি লাভ করেছে। নীতিহীনতা আর ক্ষমতার অপব্যবহারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ফজলে ইলাহি ১৯৪৭-এ মুসলিম লীগের 'চোঙা-ফোঁকানো' কর্মী হয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছেন। সোহরাওয়ার্দীর সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী হয়েছেন, স্বাধীন বাংলাদেশেও প্রতিটি সরকারের আমলে মন্ত্রী থেকেছেন। ফজলে ইলাহি নিজদল থেকে বের হয়ে সরকারি দলে যোগ দিয়েছেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করেন :

> আমি যোগ না দিলে সরকারের মন্ত্রিত্বের আসন কি খালি থাকত? কখনো কোনো মন্ত্রিত্বের আসন খালি থাকতে দেখেছ? সিরাজদ্দৌলা, মীর জাফরের আমল থেকে শুরু করে গোটা বাংলার ইতিহাসটা খুঁজে দেখো। ক্ষমতার আসন কি কখনো খালি পড়ে থাকে? [৩৯]

মানবজীবনের স্খলন, অনৈতিকতা আর নিষ্ঠুরতার বিবরণ খুঁজে পাওয়া যায় ইলাহির স্মৃতিচারণায়। ফজলে ইলাহির বাবা যখন তিন বছর জেলে ছিল, তখনই সে বখাটে ছেলেদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে চরিত্রের স্খলন ঘটিয়েছিল। রেঙ্গুন প্রবাসী চাচাতো ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ার ফলে তার চারিত্রিক স্খলনের পরিচয় আমরা পাই। অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে ভ্রাতৃবধূ সমাজে লোকলজ্জার ভয়ে প্রবাসফেরত স্বামীর সঙ্গে কৃত্রিম ঝগড়া সৃষ্টি করে আত্মহত্যা করে। এই আত্মহত্যার জন্য ফজলে ইলাহির মনে একটুও অনুশোচনা নেই। দোষটি নিজের কাঁধে নিতেও সে রাজি নয়। তার মতে, ভ্রাতৃবধূর প্ররোচনায় সে এ কাজ করেছে। স্বার্থপরতা আর নিষ্ঠুরতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল ফজলে ইলাহির অপকর্মগুলো। গতানুগতিক সমাজকাঠামাতে নারীরা সর্বদা পুরুষের চেয়ে নিচে অবস্থান করে। তাই অন্তঃসত্ত্বা এ নারীকে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হতে হয়, অথচ ফজলে ইলাহিকে সে কলঙ্ক একটুও স্পর্শ করে না।

সম্পত্তি, অর্থ আর বিত্তের লোভ ছড়িয়ে আছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সম্পত্তির লোভে আর পরিবারে নিজের অবস্থান দৃঢ় করার জন্যই ফজলে ইলাহি ফুলের মতো ফুটফুটে সৎ ভাইকে দুধের সাথে বিষ মিশিয়ে হত্যা করে। সমাজের এই রূঢ় সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন যে, মানুষের মনে অর্থ-বিত্ত-খ্যাতির লোভ এতটাই প্রবল যে, কোনো অন্যায় কাজের জন্য অনুশোচনাটুকুও ফজলে ইলাহির মতো বিত্তবান বুর্জোয়া শ্রেণির মানুষের মনে অবশিষ্ট নেই। মাওলা বক্স এই বুর্জোয়া শ্রেণির কাছ থেকে সুবিধা আদায়ে তৎপর হলেও মানুষের জন্য ভালোবাসা তার মনে আছে। তাই মন্ত্রীর জীবন-কথা শুনতে গিয়ে ঘৃণায় ভরে ওঠে তার মন।

নিষ্ঠুরতার ইতি ঘটেনি সেখানে, বরং ফজলে ইলাহির সমগ্র জীবনব্যাপী নিষ্ঠুরতার ছায়া প্রসারিত হয়েছিল। ফাজিলপুর স্কুলে হেডমাস্টারের ঘরে আগুন দেওয়ার ঘটনার মাধ্যমে লেখক বাংলার হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক ভেদকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। দেশ বিভাগ-পূর্ববর্তী সময়ে ফজলে ইলাহির স্কুলে অধিকাংশ ছাত্রই ছিল হিন্দু। সে সময়ে হিন্দুরা লেখাপড়া, চাকুরি, জমিদারি প্রভৃতিতে মুসলমানদের চেয়ে ছিল অগ্রসর। সে-গ্রামের অধিকাংশ লোক মুসলমান হলেও তারা ছিল অশিক্ষিত কৃষক। কৃষকের সন্তান বাকি ও ফজলে ইলাহি গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া করলেও বরাবরই ছিল খারাপ ছাত্র। বাকির

প্ররোচনায় সরস্বতী পূজা আর ঈদে-মিলাদুন্নবী উদযাপন নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। সেই ঘটনা থেকেই সাম্প্রদায়িক ভেদের তীব্রতাকে লেখক প্রকাশ করেছেন। স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার কুলদা বাবু মুসলমানের নিন্দা করলে বাকি ও ফজলে ইলাহি এক রাতে তার মাথায় প্রশ্রাব করে দেয়। উত্তেজিত হিন্দু শিক্ষকেরা এর বিচার দাবি করে। শাস্তি হিসেবে এ দুজনকে বহিষ্কার করা হলে মুসলমানরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। পীরের ছেলে ফজলে ইলাহির শাস্তি তারা মেনে নিতে পারে না। এভাবেই ক্ষুদ্র ঘটনাসূত্রে গ্রামবাংলার সাম্প্রদায়িক ভেদকে চিহ্নিত করেছেন লেখক। কিন্তু এই ভেদরেখাকে অতিক্রম করেও প্রকৃত মানুষ সমাজে থাকে যারা ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে মনুষ্যত্বকেই বড়ো করে দেখে। হেডমাস্টার এমনই একজন মানুষ। হিন্দু হয়েও তিনি মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে হযরত মুহম্মদ (সা.) সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন, ছাত্রদের ঈদে-মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান পালনের অনুমতি দেন। অথচ বাকির প্ররোচনায় ফজলে ইলাহি তার ঘরে আগুন দেয়। বাকি হেডমাস্টারের ঘরে আগুন দেওয়ার পক্ষে যুক্তি হিসেবে বের করে হেডমাস্টার কংগ্রেসের লোক, মুসলমানের শত্রু। অবশ্য হেডমাস্টারের বাড়িতে আগুন দেওয়ার ব্যাপারে ফজলে ইলাহি কিছুটা নিরুৎসাহিত থাকলেও তার বাবার মুরিদ আবদুর রহমানের স্ত্রীর সাথে গোপন সম্পর্কের ব্যাপারে বাকি ইঙ্গিত করাতে মানসিক ভীতি থেকেই সে এ কাজটি করতে বাধ্য হয়েছিল। সমালোচকের মতে :

> হিন্দু মধ্যবিত্তের নাক সিটকানো আর পশ্চাৎপদ মুসলমান মধ্যবিত্তের হীনমন্যতা কিভাবে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়, দেশের প্রধান দুটি সম্প্রদায়কে ঠেলে দেয় সংঘর্ষের দিকে, প্ররোচনা দেয় দেশ ভাগের, এই মন্ত্রীর জীবন থেকেই ছফা তার সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্যময় চলচ্ছবি লিখে ফেলেন।[৪০]

মুদ্রাকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় অর্থ আর বিত্তের মোহ মানুষের মানবিক বোধকে নিপতিত করে অতলান্ত শূন্যতার দিকে। তাই পারিবারিক বন্ধন সেখানে নেই বললেই চলে। ফজলে ইলাহি রোগশয্যায় কাতর হলেও তার পাশে এসে দাঁড়ায় না পরিবারের কেউ। বিশিষ্টজন এলে চারপাশে টিভি ক্যামেরা আর সাংবাদিকদের ভিড় জমে যায়, তখনই স্ত্রী-সন্তানেরা কাঁদো কাঁদো মুখে দাঁড়িয়ে থাকে মাথার পাশে। অন্য সময় তাদের দেখাও পাওয়া যায় না। পারিবারিক বন্ধনহীনতার স্পষ্ট ছবি ফজলে ইলাহি নিজের চোখের সামনেই দেখতে পান :

> আমার পুত্র দুটো হারামজাদা। শকুনের মতো ওত পেতে অপেক্ষা করে আছে কখন আমার মৃত্যু হয়। কবরে মাটি চাপা দেয়ার আগে বাড়ি-গাড়ি-ব্যাংকে জমানো টাকার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। মেয়েরা ভাইদের সঙ্গে সম্পত্তি অধিকার আদায়ের জন্য হাইকোর্টে মামলা জুড়ে দেবে। ছোট বিবি, যাকে আমি এত ভালোবাসি, মনের মতো মানুষ পেলে চুটিয়ে প্রেম করবে। বিশ বছর বুড়ো মানুষের সঙ্গে সংসার করে যে গ্লানি, যে ক্লান্তি তার জমেছে আর বিশ বছর একটা ছোকড়ার সঙ্গে কাটিয়ে সে ক্ষতি পুষিয়ে নেবে। আহা মাওলা বক্স একটা উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে শত্রুরা আমার নামের ওপর কালি মাখিয়ে দেবে।[৪১]

পুঁজিবাদ মানুষকে সম্পর্কহীন করে তোলে, সেই সম্পর্কহীনতার হাহাকার ইলাহির জীবনে বর্তমান। পারিবারিক বন্ধনহীনতার বিপরীতে ঔপন্যাসিক উপস্থাপন করেছেন মাওলা বক্সের পরিবারের চমৎকার বন্ধনের চিত্র। অর্থ-বিত্তের লোভ তারও আছে, ধনী সে হতে

পারেনি; কুক্ষিগত ক্ষমতার কাছে সে বরাবরই বন্দি তবু তার রয়েছে বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সুন্দর একটি পরিবার। কলুষিত সমাজ দেহের অভ্যন্তরে ক্ষমতা আর বিত্তের লোভে আত্মহারা মানুষগুলোর ভেতরটা অন্তঃসারশূন্য হয়ে যায়। নীতি, মূল্যবোধ, পারিবারিক বন্ধন, স্নেহ-ভালোবাসা আর সেখানে অবশিষ্ট থাকে না। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে ফজলে ইলাহিও বুঝতে পেরেছে :

> খ্যাতি প্রতিপত্তি ওসব নেহাতই ফাঁপা জিনিস। জীবনে ওসবের কানাকড়িও মুল্য নেই। আমি কথাটা খুব ভালো করে বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি সারাজীবন খ্যাতি প্রতিপত্তি ক্ষমতা ওসবের পুজো করেছি। এটা মানুষের আত্মার একটা রোগ বিশেষ। জীবনে কোনোদিন কথাটা মনে হয়নি। আমার মৃত্যুর ছায়া মনে হঠাৎ করে এ উপলব্ধি জাগিয়ে দিল। মৃত্যুর পরেও এই রোগের কবল থেকে মুক্ত হতে পারব না।[৪২]

আহমদ ছফার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর ভেতরের অবক্ষয় ধরা পড়েছে *মরণ বিলাস* উপন্যাসে। একদিকে এদেশীয় রাজনীতির দীনতা অপরদিকে সমাজ পরিস্থিতিতে ব্যক্তির নির্মমতার চিত্র আলোচ্য উপন্যাস। সমাজসচেতন শিল্পী আহমদ ছফা বাংলাদেশের ঘুণে ধরা সমাজের বাস্তবতাকে প্রকাশ করেছেন আন্তরিকতার সঙ্গে। সমালোচকের মতে :

> জীবনের স্বাভাবিক গতিধারার মাঝে লুকিয়ে থাকা অস্বাভাবিক সব ঘটনা ও জীবন প্রক্রিয়ার কথা সরল গতিতে তুলে ধরেছেন বর্ণাঢ্য জীবনে অন্তরীণ অন্ধকারাচ্ছন্ন অলিগলির অন্তস্তলে পদাঘাত করে। খুব সাবলীল গতিতে উন্মোচন করেছেন ক্ষমতার মসৃণ আভরণের অন্তরালে বলীয়ান হয়ে ওঠা পীড়াদায়ক সব শক্তি, কীর্তি ও কীর্তিমানদের।[৪৩]

আহমদ ছফা *মরণ বিলাস* উপন্যাসে তৎকালীন সমাজ ও অশুভ রাজনীতির যে চিত্র উপহার দিয়েছেন পাঠকসমাজকে, তাতে কোনো প্রকার অসত্য বিদ্যমান নেই। এটাই সামাজিক বাস্তবতা, প্রকৃত দৃশ্যচিত্র। সত্যিকারের রূঢ় সামাজিক বাস্তবতাচিত্র উপহার দেওয়াই মহান লেখকের ধর্ম। আহমদ ছফা জীবিতকালে কোনো অশুভ শক্তির চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে অনায়াসে এই মহান দায়িত্ব পালন করে যেতে পেরেছেন। এখানেই আহমদ ছফার সৃষ্টিসাফল্য ও সার্থকতা।

অলাতচক্র

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কলকাতায় বাংলাদেশি শরণার্থীদের জীবন, তাদের দুঃখ-কষ্ট, হতাশা, চাওয়া-পাওয়াকে উপজীব্য করে রচিত *অলাতচক্র* বাংলা উপন্যাসের ধারায় আরেকটি উল্লেখ্যযোগ্য সংযোজন। আহমদ ছফা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে অবস্থান করেছেন কলকাতায়, তাঁর সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে রচিত এ উপন্যাস। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সরাসরি বর্ণনা এ উপন্যাসে না থাকলেও মুক্তিযুদ্ধকালীন ব্যক্তির সংকট, সামাজিক অবস্থা, যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ও যুদ্ধের রাজনৈতিক পটভূমি এর উপজীব্য। উপন্যাসটির মূল চরিত্র দানিয়েল ও তার প্রেমিকা তায়েবার মাধ্যমে লেখক তৎকালীন কলকাতায় আশ্রয় গ্রহণকারী বাংলাদেশিদের সাধারণ জীবনযাত্রার পাশাপাশি তাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার বাস্তবচিত্র

অঙ্কনে সচেষ্ট হয়েছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা, এর সম্ভাবনা ও সফলতা সম্পর্কে বাংলাদেশি শরণার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সার্থক রূপায়ণ করেছেন তিনি। পঁচিশে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হামলার পর বাংলাদেশি যুবক দানিয়েল স্বদেশ ছেড়ে আর সবার মতো কলকাতার একটি মেসে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল। দানিয়েল তিনবার চেষ্টা করেও যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিতে পারেনি। ট্রেনিং ক্যাম্পের কর্তাব্যক্তিরা তাকে সৃষ্টিশীল কাজ করার পরামর্শ দিলেও তার মনে জমে আছে অতৃপ্তি আর হতাশা :

> যুদ্ধে চলে গেলে ভালো হত। দেশের স্বাধীনতার কতটুকু করতে পারতাম জানিনে। তবে বেঁচে থাকবার একটা উদ্দেশ্য চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করতে পারতাম।[৪৪]

মধ্যবিত্ত শ্রেণির আত্মিক সংকট মুক্তিযুদ্ধকালে তীব্র আকার ধারণ করেছিল। বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা কেউ কেউ প্রগতিপন্থী রাজনীতিকে সামনে রেখে মুক্তির স্বাদ পেতে চেয়েছিল, তবু কিসের বন্ধন যেন তাদের আটকে রাখে। সমালোচকের মতে :

> বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের যদিও কেউ কেউ প্রগতিপন্থী রাজনীতিকে সমানে রেখে মুক্তির স্বাদ পেতে বিশ্বাসী তবুও কিসের বন্ধন যেনো তাদের আটকে রাখে একটা ঘেরাকলে। বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা সবসময়ই পিছুটানে হঠাৎ থমকে দাঁড়ান। মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটেছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ পরিবেশেও তারা থেকেছেন নিষ্ক্রিয় অথচ ছাত্র, কৃষক, সাধারণ মানুষ, কুলি, মজুর তারা আত্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাণের মায়া না করে অন্বিষ্ট অর্জনের প্রচেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। মধ্যবিত্তের দোলাচলতা থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাদের মাঝেও ছিলো। ছিলো বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, মোট কথা সকল শ্রেণির। কেউ সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, কেউবা মুক্তিযোদ্ধাদের অসময়ে আশ্রয় দিয়ে, কেউবা লেখনী শক্তি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করে — স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন সন্দেহ নেই।[৪৫]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সামাজিক সংকট প্রবল হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় শিবিরে, শরণার্থীদের ক্যাম্পে দিন যাপনের চিত্র ছিল ভয়াবহ। প্রতিটি ক্যাম্পে প্রতিদিন মারা গিয়েছে শিশু আর বৃদ্ধা। বনগাঁ থেকে শেয়ালদা স্টেশনের প্লাটফর্মে শুধুই বাংলাদেশি মানুষ। তাদের চোখ থেকে স্বপ্ন দূরীভূত হয়ে গেছে। পাশে মানুষ মরে পড়ে থাকলেও নির্বিকারভাবে খেতে বসে অন্যরা। এ অবস্থায় লড়াই করার প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকার পরও সুযোগ পায় না নরেশের মতো অনেকেই। কেননা :

> নেতা এবং দল এসব মানুষের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করল। কিন্তু তাদের সংগ্রামের ক্ষেত্র রচনা করতে ব্যর্থ হল। নেতা গেল পারিস্তানের কারাগারে। আর আমরা পাকিস্তানি সৈন্যদের আক্রমণের মুখে দেশ ছেড়ে চলে এলাম।[৪৬]

যুদ্ধের সময় এক শ্রেণির সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ীরা 'জয়বাংলা' শব্দটিকে ব্যবহার করে ব্যবসাকে সুদৃঢ় করে তোলে। সমাজের এই বাস্তবচিত্র উন্মোচনে ঔপন্যাসিক ছফার দৃষ্টি ছিল ক্রম প্রসারিত :

> শেয়ালদার মোড়ে মোড়ে সবচে সস্তা, সবচে ঠুনকো স্পঞ্জের স্যান্ডেলের নাম জয়বাংলা স্যান্ডেল। এক হপ্তার মধ্যে যে-গেঞ্জি শরীরের মায়া ত্যাগ করে তার নাম জয়বাংলা গেঞ্জি। জয়বাংলা সাবান,

> জয়বাংলা ছাতা কত কিছু জিনিস বাজারে বাজারে ছেড়েছে কলকাতার ব্যবসায়ীরা। দামে সস্তা, টেকার বেলায়ও তেমন। বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের ট্যাকের দিকে নজর রেখে এ সকল পণ্য বাজারে ছাড়া হয়েছে। কিছুদিন আগে যে চোখওঠা রোগটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, কলকাতার মানুষ মমতাবশত তারও নামকরণ করেছিল জয়বাংলা।[৪৭]

যুদ্ধকালীন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অর্থনৈতিক কষ্টের যে প্রাবল্য আহমদ ছফা বাস্তব জীবনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সে-বাস্তবতাই চিত্রিত হয়েছে এ উপন্যাসে। অসুস্থ তায়েবকে হাসপাতালে দেখতে হলে প্রতিদিন কম করে হলেও পাঁচটি টাকা সংগ্রহের জন্য রাস্তায় কুলিগিরি করতেও দানিয়েলের সংকোচ নেই। অনুবাদকের কাজ সে পায় অনিমেষবাবুর সংবাদপত্রে। সাপ্তাহিক সে-কাগজটিতে গোরা হিন্দুদের জন্য লেখা বের হয়। দানিয়েলের মনে হয় :

> আমার অন্তরাত্মা বলছে, এই কাজের ভেতরে এমন কিছু আছে, গ্রহণ করলে আমি নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে যাব। কিন্তু তায়েবার কথা মনে হওয়ায় বুকটা হুহু করে উঠল। মনে মনে কথা দিলাম অনুবাদকের কাজটা আমি করব।[৪৮]

ব্যক্তির আত্মদ্বন্দ্বের পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল সময়ের জটিলাবর্ত। তাই নিজের বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করে দানিয়েল অনুবাদকের কাজে রাজি হয়েছিল অর্থের প্রয়োজনেই।

সমাজ ও সময়ের চাপে মানুষের মন ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে বাধ্য। একসময় কলকাতার বুকে বাংলাদেশি মানুষের মাঝে যে আন্তরিকতা ছিল সেটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। দানিয়েল অনুভব করে :

> মানবিক মর্যাদাবোধটুকুও আস্তে আস্তে আমাদের লোপ পেতে বসেছে। লোহালক্কড় ফেলে রাখলে যেমন মরচে ধরে, আমাদের মধ্যেও তেমনি স্তরে স্তরে হতাশা জমে ক্রমাগত অমানুষ হয়ে উঠছি।[৪৯]

তায়েবার চূড়ান্ত অসুস্থ অবস্থায় ডা. মাইতি দানিয়েলকে তায়েবার আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ জানালে দানিয়েল ভাবে :

> এত বড় একটা দুঃসংবাদ শোনার পরও আমার মধ্যে কোনো ভাবান্তর হল না। আমি দিব্যি হাঁটাচলা করতে পারছি। ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু সামাল দিতে পারছি। আমার মানসিক ধৈর্য দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। এই যুদ্ধ তলায় তলায় আমাকে কতটুকু বদলে দিয়েছে।[৫০]

এই মানসিক পরিবর্তন কেবল দানিয়েলের একার নয়, এ পরিবর্তন সে সময়ের হতাশাগ্রস্ত প্রতিটি বাঙালির।

সাম্প্রদায়িকতা আর সংখ্যালঘু নির্যাতন আহমদ ছফার উপন্যাসে বারবার ঘুরে ফিরে আসে। সাতচল্লিশের দেশ ভাগের সময় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় বাধ্য হয়েছিল দেশ ছাড়তে। দাঙ্গা আর সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ভুলতে পারে না কেউ। দানিয়েল যে হোস্টেলে থাকে সেখানকার অনেকেরই পূর্বনিবাস পূর্ববাংলা। ভারতে এসে দানিয়েলরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল, তাদের যন্ত্রণাও কম ছিল না। দানিয়েলের অনুভূতিতে তা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে :

> সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা অংশের অত্যাচারে এদের দেশ ছাড়তে হয়েছে। অনেকের গায়ে টোকা দিলেই গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, বরিশাল, ঝিনাইদহ এসকল এলাকার গন্ধ পাওয়া যাবে। জীবন্ত ছাগল থেকে চামড়া তুলে নিলে যে অবস্থা হয়, এদের দশাও অনেকটা সেরকম। কলকাতা শহরে থাকে বটে, কিন্তু মনের ভেতরে ঢেউ খেলছে পূর্ববাংলার দীঘল বাঁকের নদী, আঁকাবাঁকা মেঠো পথ, হাট-ঘাট ক্ষেত, ফসল, গরু-বাছুর। আমি গোসল করতে গেলেই নিজেরা বলাবলি করত, কীভাবে একজনের বোনকে মুসলমান চেয়ারম্যানের ছেলে অপমান করেছে। অন্যজন বলত পাশের গাঁয়ের মুসলমানেরা এক রাতের মধ্যে ক্ষেতের সব ফসল কেটে নিয়ে গেছে। ছোটখাটো একটি ছেলে তো প্রায় প্রতিদিন উর্দু পড়াবার মৌলবিকে নিয়ে নিত্যনতুন কৌতুক রচনা করত। ভাবতাম আমাকে নেহায়েত কষ্ট দেওয়ার জন্যই এরা এসব বলাবলি করছে। অথচ মনে মনে প্রতিবাদ করারও কিছু নেই। প্রায় প্রতিটি ঘটনাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য। উঃ সংখ্যালঘু হওয়ার কী যন্ত্রণা![৫১]

দানিয়েলের এ যন্ত্রণা কেবল ব্যক্তি দানিয়েলের নয়, এ যন্ত্রণা সমষ্টির। এক সময় দানিয়েলের সঙ্গে হোস্টেলের ছাত্রদেরও এক আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দানিয়েল অনুভব করে 'সম্যক পরিচয়ের অভাবই হচ্ছে মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষের মূল।'[৫২]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ব্যক্তি ও সমষ্টির দুঃখ-বেদনা-অসহায়ত্বের পাশপাশি রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ইতিহাসও বর্ণিত উপন্যাসের ঘটনাসূত্রে। ইতিহাসের ঘটনাকে উপন্যাসে তুলে ধরা সহজ নয়। এ দুঃসাধ্য কাজটি করতে কঠোর শিল্পনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন আহমদ ছফা। অশীন দাশ গুপ্তের মতে :

> ইতিহাসের কল্পনা আর সাহিত্যের কল্পনা এক নয়। ইতিহাস শেষ পর্যন্ত থাকে ঘটনার বাইরে। তাই ঐতিহাসিক দর্শকমাত্র। কিন্তু সাহিত্য জীবনের অভ্যন্তরীণ সত্য তুলে ধরে, তাই সাহিত্যিক স্রষ্টা।[৫৩]

আহমদ ছফার এ উপন্যাসে চরিত্রের কর্ম ও ভাবনায় মুক্তিযুদ্ধের রাজনীতি, যুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষের ভূমিকা, আত্মত্যাগ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আন্তর্জাতিক ভূমিকা প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছে উপন্যাসের চরিত্ররা। কারো কারো মতে, শেখ সাহেব মানুষকে ফেলেছেন এক অনিশ্চয়তার মধ্যে, আর কেউ কেউ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে শেখ মুজিবের রাজনীতিই বাংলাদেশকে স্বাধীন করবে। প্রমোদবাবু বলেন :

> শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে যেটুকু জেনেছি তা থেকে স্থির কোনো ধারণা গঠন করা সম্ভব নয়। আমাকে কেউ কেউ বলেছেন মুজিব একজন গাঢ় সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ের সময় সোহরাওয়ার্দির চ্যালা ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তিনি মহাত্মাজীর মন্ত্রশিষ্য। অহিংস অসহযোগনীতি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এই বিরাট গণ সংগ্রাম রচনা করেছেন। দু চারজন কমিউনিস্ট বন্ধুর কাছে জিজ্ঞেস করে যা জেনেছি তাতে সংশয়টা আরো বেড়ে গেল। মুজিব নাকি ঘোরতর কমিউনিস্ট বিরোধী। মুজিব লোকটা কেমন, তাঁর রাজনৈতিক দর্শন কী সে ব্যাপারে স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলতে পারেননি। আমার কাছে সবটা ধোঁয়া ধোঁয়া ছায়া ছায়া মনে হয়। কিন্তু একটা বিষয় দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। মানুষটার ভেতর নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। নইলে তাঁর ডাকে এতগুলো মানুষ বেরিয়ে এল কেমন করে।[৫৪]

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক দোলাচলবৃত্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একটি দলের ভেতর তৈরি হয়েছিল অনেক উপদল। তাজউদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মোশতাক আহমদ প্রমুখের ভূমিকা নিয়ে মানুষের মনে হাজার প্রশ্নের উদয় হয়েছিল। ক্যাপ্টেন হাসান মনে করেন :

> তাজউদ্দিন বলুন, মুশতাক বলুন থিয়েটার রোডে যারা বসে তারা সকলে একইরকম। নিজেদের মধ্যে দলাদলি করছে, সর্বক্ষণ একজন আরেকজনকে ল্যাং মারার তালে আছে।[৫৫]

ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে সাহায্য করতে দীর্ঘ সময় নেওয়ার বিতর্কিত বিষয়টি অবতারণা করেছেন লেখক। উপন্যাসের প্রারম্ভেই একটি নাটক অভিনীত হয় যাতে স্লোগান দেওয়া হয় 'এহিয়া ইন্দিরা এক হ্যায়।'[৫৬] ইন্দিরা গান্ধী শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্মতিতে বাংলাদেশকে যুদ্ধে সহায়তা করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশকে তিনি যে সহায়তা করেছেন তা মূলত যুদ্ধের শেষ কয়েক মাস। তাঁর উদ্দেশ্য ভারতবাসীর আবেগকে তাঁর রাজনীতির ইতিবাচকতায় যুক্ত করা। ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দর্শনও উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে ইয়াহিয়া খান ভেবেছিল যুদ্ধের সময় ৮০ লক্ষ হিন্দুকে অত্যাচার করে ভারতে পাঠাতে পারলেই হিন্দুর জমি ও সম্পদ দখল করে মুসলমানরা খুশিই হবে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের জনগণ তা চায়নি, তারা চেয়েছিল স্বাধীন দেশ। তাই মুক্তিযুদ্ধে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করেছিল অনেক মানুষ। দেশের দুর্দিনে রেজোয়ানের বড়ো বোন একজন পাকিস্তানি মেজরকে বিয়ে করলে আত্মহত্যা করে রেজোয়ান। মুক্তির আকাঙ্ক্ষার তীব্রতায় মানুষ যখন বিকারগ্রস্ত সে-সময় দেশের শত্রুকে বিয়ে করাকে মেনে নিতে পারে না স্বাধীনতা প্রত্যাশী এ যুবক। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ও বিরোধিতা দুইই ছিল ভারতীয় জনগণের মনে। তায়েবার চাচা মনে করেন, দেশভাগের ফলে যে পাকিস্তান জন্ম নিয়েছে তা ভেঙে ফেলা উচিত নয়, মুক্তিযুদ্ধের নাম তারা শুনতে পারে না। কিন্তু এর বিপরীত চিত্রও রয়েছে। ডা. মাইতি, প্রমাদবাবু, অর্চনা তারা চায় বাংলাদেশ স্বাধীন হোক। ড. মাইতি মনে করেন :

> আপনাদের গোটা জাতি যে ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তার প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। মানুষের সবচাইতে মহত্তম সম্পদ তার চরিত্র, সে বস্তু আপনার দেশের অনেক যুবকের মধ্যে আমি বিকশিত অবস্থায় দেখেছি। কোনো কোনো সময়ে আপনাদের প্রতি এমন একটা আকর্ষণ অনুভব করি, ভুলে যাই যে, আমি একজন ভারতীয় নাগরিক। ... ক্রমাগত মনে হচ্ছে আমি নিজেই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের একটা অংশ। এখন আমার ভারতীয় সত্তা এবং বাঙালি সত্তা পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এখন বাঙালি বলে ভাবতে আমার খুব অহঙ্কার হয়।[৫৭]

এভাবেই মুক্তিযুদ্ধ সময়পর্বে স্বাধীনতার স্পৃহা বাঙালির হৃদয়ে অগ্নিশিখার মতো জ্বলজ্বল করে। আলোচ্য উপন্যাসে লেখকের সমাজবোধ ও রাজনীতি-চেতনার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, ভারতে অবস্থানকারী বাঙালির যন্ত্রণা, সমষ্টিগত প্রত্যাশা-হতাশা-বেদনাবোধের চিত্র রূপায়িত হয়েছে।

গাভী বিত্তান্ত

শৈলীর স্বাতন্ত্র্যে এবং বিষয়ের ব্যতিক্রমী বিন্যাসে আহমদ ছফার ভিন্ন ধারার উপন্যাস *গাভী বিত্তান্ত* রচিত হয়েছে আমাদের দেশের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত এবং ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নবনিযুক্ত উপাচার্যের নিয়োগ, তার নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্বাচন, শিক্ষকদের বিভিন্ন দল, ক্যাম্পাসে ছাত্র-রাজনীতির স্বরূপ ও ধ্বংসযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ, দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তথা প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সরকারি ও বিরোধীদলের রাজনীতিবিদগণের সাথে উপাচার্যের আন্তঃসম্পর্ক, ভীতি ও বিনয় প্রভৃতি বিষয় নিয়ে। উপর্যুক্ত প্রসঙ্গগুলোর সাথে উপাচার্যের গাভী পালনের অন্তর্গত স্পৃহা যুক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, উপন্যাসটি রচিত হয়েছে তখন যখন দেশে চলছে গণতান্ত্রিক রাজনীতি। উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসেবেও লেখক সেই সময়কেই নির্বাচন কছেন। এ উপন্যাসের প্রেক্ষাপট যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তা লেখক জানিয়েছেন এক সাক্ষাৎকারে :

> বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ঠিকাদার একটা গাভী উপহার দিয়েছিলো। এই গাভীকে ঘিরেই আমার উপন্যাস। বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় নেমে গেছে আশা করি এই উপন্যাসের মধ্যে আমি দেখাতে পারবো। লেখাটি দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে শেষ করতে পরবো। বিশ্ববিদ্যালয় বলতে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বুঝি। এই বিশ্ববিদ্যালয় আমার আলমামেটর। আলমামেটর শব্দের অর্থ হলো জ্ঞানদায়িনী মা।[৫৮]

বস্তুত *গাভী বিত্তান্ত* উপন্যাসে আহমদ ছফার সমাজ-ভাবনা ও রাজনীতি-চেতনার যুগপৎ সমন্বয় ঘটেছে। প্রতীকধর্মী এ উপন্যাস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ঘটনাসূত্রে অগ্রসর হয়েছে। আবু জুনায়েদ ভাগ্যের জোরেই উপাচার্য হয়েছেন এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল গৌরবময় অতীত। এখানেই শুরু হয়েছিল মহান ভাষা আন্দোলন। মুক্তিযুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে এখান থেকেই। কিন্তু বিশ শতকের শেষ দশকে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। আহমদ ছফা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগযোগও ছিল গভীর। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তমান অবস্থার জন্য তাঁর মনে ক্ষোভ-দুঃখ জমা ছিল। ফলে তার পর্যবেক্ষণ শক্তিতে ধরা পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অসংগতি ও দুর্নীতির চিত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসমাজের বিভিন্ন দলে বিভক্তির চিত্র এ উপন্যাসে লেখক উপস্থাপন করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। ব্যক্তিগত শত্রুতার জের ধরে রসায়ন বিভাগের সুন্দরী অবিবাহিতা শিক্ষিকা দিলরুবা খানম উপাচার্য বদলের দাবি করেন, তার সাথে যোগ দেন অনেকেই। ডোরাকাটা দলের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র ধরেই আবু জুনায়েদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। অথচ তার ব্যক্তিত্ব বলে কিছুই নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে মেধা ও মননের চর্চা হওয়ার কথা সেখানে একজন অযোগ্য ব্যক্তির শীর্ষপদে ক্ষমতালাভ বিশ্ববিদ্যালয়ের মানকে নিচের দিকেই টেনে নিয়ে যায়।

এ উপন্যাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিস্থিতি আবু জুনায়েদের কর্ম ও ভাবনার সূত্রে প্রকাশ করেছেন লেখক। দেশের অবস্থা এমনই হয়েছিল যে, ছাত্ররা পড়ালেখার চেয়ে

রাজনীতি, মিছিল-মিটিংয়ে ব্যস্ত থাকে। অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র খুনের ঘটনা নিয়ে স্বার্থান্বেষী দুই রাজনৈতিক ছাত্রনেতারা মিছিল করে, দু-দলই দাবি করে ছাত্রটি তাদের দলের লোক। আহমদ ছফার চিন্তার গভীরতা প্রসারিত ছিল বাস্তবতার মূলে, তাই বাস্তব অভিজ্ঞতাকে তিনি উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। মৃত ছাত্রকে নিজের দলের পরিচয় দিতে পারলে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি সম্ভব। এ ব্যাপারটি কেবল একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক অবস্থাকেই নয় বরং বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাপিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির প্রকৃত স্বরূপকে উন্মোচন করে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সর্বোচ্চ স্থান হলেও সেখানে প্রায়ই থেমে যায় শিক্ষা কার্যক্রম। ভাতের চালে কাঁকর বেশি পাওয়া গেলে, হলে পানি না থাকলে শুরু হয় আন্দোলন। পরীক্ষার তারিখ পেছানোর দাবিতে উপাচার্য ভবন ভাংচুর, কর্মচারী আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, ছাত্রসংগঠনের সম্মুখযুদ্ধ এরকম নানা সমস্যায় আবর্তিত হতে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়। আবু জুনায়েদ উপাচার্য হয়ে আসার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিস্থিতি তিনি অনুধাবন করতে পারলেও তার কিছুই করার থাকে না। টাকা নিয়ে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে নৃতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক আব্দুর রহমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হলেও নিরুপায় আবু জুনায়েদ। কেননা, সিনেট-সিন্ডিকেটে আব্দুর রহমান দলে ভারি। এসব অরাজকতা একটি দেশের মূল্যবোধের অবক্ষয়কেই চিহ্নিত করে।

দেশের প্রভাবশালী ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র যে বিশ্ববিদ্যালয়, সে-বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের গাভী পালন এবং উপাচার্য ভবনে গোয়ালঘর নির্মাণ পাঠক মনে অসামঞ্জস্যবোধের জন্ম দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকাদার শেখ তবারক আলী উপাচার্যকে একটি গাভী উপহার দেন এবং গোয়ালঘর নির্মাণেও সহায়তা করেন। রসায়ন বিভাগের প্রভাষক নিয়োগ পরীক্ষায় উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও গোয়ালঘর নির্মাণের আনন্দে আবু জুনায়েদ সেখানে অনুপস্থিত থাকেন। আবু জুনায়েদ জানেন যে, তার অনুপস্থিতিতে ড. করিম অনেক যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে নিজের আত্মীয়কে নিয়োগ দেবেন। আবু জুনায়েদের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা সমগ্র উপন্যাসে অত্যন্ত বাস্তবোচিতভাবে লেখক উপস্থাপন করেছেন। ব্যঙ্গ আর শ্লেষের মাধ্যমে আহমদ ছফা একথাই জানাতে চেয়েছেন যে, বাংলাদেশে মেধা কিংবা শিক্ষার চেয়ে ক্ষমতাই হয়ে উঠেছে প্রধান।

উপাচার্যের এই গাভী ও গোয়ালঘরকে কেন্দ্র করে একটি আড্ডা চালু হয়ে যায়। ড. সাইফুল আলম আবু জুনায়েদের গোয়ালঘরে গিয়ে অনুরোধ করেন চার কক্ষের বাসার জন্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রের শিক্ষক জনার্দন চক্রবর্তী আসেন চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য। এমনকি দেলোয়ার হোসেনের উচ্চমাধ্যমিকে তৃতীয় বিভাগ ছিল বলে অধ্যাপক হতে পারছেন না — তাই তিনি তদবির করতে আসেন আবু জুনায়েদের গোয়াল ঘরের আড্ডায়। এই গোয়ালঘরই যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। এসব ঘটনা শিক্ষকদের আর্থিক ও মানসিক দৃঢ়তার অভাবকেই স্পষ্ট করে তোলে।

দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির অধঃপতন, চাঁদাবাজি, বিত্তবানদের অর্থ-বিত্তের মালিক হওয়ার প্রক্রিয়া উঠে এসেছে আবু জুনায়েদ এবং তবারক আলীর কথার মাধ্যমে। তবারক

আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজের ঠিকাদার। সন্ত্রাসী আর চাঁদাবাজরা তার কাছে এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা চাঁদার দাবিতে এক ওভারসিয়রের পায়ে গুলি করে। এছাড়া টেন্ডার ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত মাস্তানদের তবারক আলী প্রতিমাসে পাঁচ হাজার করে টাকা দিতে বাধ্য। কেননা :

> তারাই তো আজকের গোটা বাংলাদেশটা হাতের তালুর তলায় চেপে রেখেছে। ... এদের না হলে ক্ষমতাসীন দলের চলে না, বিরোধী দলের চলে না।[৫৯]

স্বাধীনতার পূর্বে পাক-শাসকের অত্যাচার ছিল সীমাহীন। কিন্তু স্বাধীনতার পর এদেশের মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতার অবয়ব দেখেনি। একটি বিশেষ শ্রেণির হাতে জিম্মি সাধারণ মানুষ। আহমদ ছফা মুখোশধারী ব্যক্তিদের এবং পতনশীল সমাজের মুখোশ উন্মোচনে ছিলেন তৎপর। এ উপন্যাসে গাভী পালনের সূত্র ধরেই দেশ তথা সমাজের প্রকৃত রূপকে ঔপন্যাসিক ধারণ করেছেন প্রতীকায়িতভাবে। বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক উপন্যাস হলেও এখানে তবারক আলীর কথায় উপস্থাপিত হয়েছে দেশের সামগ্রিক অবয়ব :

> দেশটা কোথায় যাচ্ছে। মোটা অংকের টাকা সরকারি দলকে দিতে হয়। বিরোধী দলকেও দিতে হয়। আমলাদের দিতে হয়, মাস্তানদের দিতে হয়। আমাদের মতো সৎ ব্যবসায়ী যারা পলিটিক্যাল ব্যাকিঙে রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছে পরিণত হয়নি, ঘরের টাকা ঢেলে ব্যবসাপাতি করে থাকে, তাদের কি টিকে থাকার কোনো উপায় আছে? [৬০]

সমাজসচেতন আহমদ ছফার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সমাজের অসহায় মানুষের দিকে। আর তাই আলোচ্য উপন্যাসে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনকথাও স্বল্প পরিসরে লেখক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। গোয়ালঘর নির্মাণের হেডমিস্ত্রির পরিবারের ঘটনা স্বল্প পরিসরে চিত্রিত হয়েছে। হেডমিস্ত্রির জামাতা পণের টাকার জন্য তার কন্যার ওপর অত্যাচার চালায়, মেয়েটি অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করে। এরকম নারী নির্যাতনের ঘটনা আমাদের সমাজে অহরহ ঘটছে। সমাজের এসব অনাচার, অত্যাচার আর ক্লেদাক্ত রূপ চিত্রণে ছফার কৃতিত্ব অতুলনীয়। পাশাপাশি নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের ভাঙনের চিত্রও বর্ণিত হয়েছে এ উপন্যাসে। জুনায়েদের সঙ্গে তার স্ত্রী নুরুন্নাহার বানুর দাম্পত্য সম্পর্ক ক্রমেই শিথিল হতে থাকে। স্ত্রী অসুস্থ থাকলেও চিন্তিত হন না আবু জুনায়েদ। উপাচার্য-পত্নী মনে করেন, গাভীটিই তার জীবনের শত্রু, গাভীর জন্যই তার স্বামী তাকে ভুলে থাকেন। তাই গাভীটিকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতেও তিনি বিচলিত হননি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ভাঙন আর নৈতিক অধঃপতনের চিত্র তবারক আলীর জামাতা আবেদ হোসেনের মাধ্যমেও লেখক তুলে ধরেছেন। আবেদ হোসেন ভালোবেসেই বিয়ে করেছিল তার সহপাঠীকে। দুই সন্তানের জনক হয়েও সে উপাচার্য কন্যা দীলুর সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে। এ ঘটনা নৈতিক অধঃপতনের চিত্রকেই স্পষ্ট করে তোলে।

সমাজজীবনের এসব অন্যায়-অত্যাচার অবলোকন করেও আহমদ ছফা হতাশ নন। আশাবাদী ছফা তাই উচ্চারণ করেন :

> মানুষের ভেতর এত প্রতিহিংসা এত রেষারেষি, এত ইঁদুরদৌড় কেন? মানুষের জীবন কত সংক্ষিপ্ত। পাখিদের ডাক শুনেই তো একটা জীবন কাটিয়ে দেয়া সম্ভব। ... এই যে মানবজীবন, তা কি একেবারে অর্থহীন? নাকি মানবজীবনের একটা লক্ষ্য আছে।[৬১]

অকৃত্রিম মানবপ্রীতি আর ভালোবাসা থেকেই আহমদ ছফার প্রত্যাশা সুন্দর ভবিষ্যতের। তাই তাঁর উপন্যাসে সমাজজীবনের বিভিন্ন অসংগতি উপস্থাপিত হলেও হতাশা নয় বরং আশাবাদই শেষ পর্যন্ত অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী

অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী উপন্যাসে লেখকের সমাজবোধ ও রাজনীতি-চেতনার অনবদ্য প্রকাশ লক্ষণীয়। আলোচ্য উপন্যাসে তিনি বাঙালি শিক্ষিত সমাজের বিশেষ কিছু মানুষের স্বরূপ উন্মোচন করে দেখিয়েছেন যে, শিক্ষা-দীক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েও মানুষের মনের কুটিলতা দূর না হলে মানুষ রুচিহীনই থেকে যায়। এ উপন্যাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষকের চিন্তা-চেতনায় নারীর অবস্থানকে স্পষ্ট করেছেন লেখক। এক্ষেত্রে দুই ধরনের মানুষ ছফার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। একদল যারা নারীর অধিকারকে, অবস্থানকে উচ্চে স্থান দিতে দ্বিধা করেন না, যেমন : ড. হাসনাত। আর একদল নারীকে মনে করে ভোগ্যপণ্য। শামারোখ যেন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক হতে না পারেন সেজন্য ড. শরিফুল ইসলাম চৌধুরী বিরোধিতা করেন। শামারোখের হয়ে কথা বলার জন্য ড. হাসনাতের নামে অপবাদ ছড়ান। এছাড়াও অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক তায়েবউদ্দিনের হীন সম্ভোগময় দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে শামারোখের দিকে। এসব ঘটনা নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিকেই স্পষ্ট করে তোলে।

নারী-পুরুষের সম্পর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখকের নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে উপন্যাসে। আহমদ ছফা বিশ্বাস করতেন, 'নারী শরীর প্রধান নয়, কিংবা মন প্রধান নয়, নারী হল এ দুয়ের সম্মিলিত রূপ।'[৬২] লেখক নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সততাকে গুরুত্ব দিতেন বলেই উপন্যাসের নায়ক জাহিদ হাসান প্রেয়সী সোহিনীর কাছে তার অতীতের ঘটনা বয়ান করে চলে। দুরদানার সাহস আর দুরন্ত স্বভাবের পরিচয় যেমন জাহিদ পেয়েছিল, তেমনি নারীত্বের দিকটিও ধরা পড়েছে তার চোখে। সমাজ আর পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়েই জাহিদের সাথে দুরদানার শেষ পর্যন্ত কোনো প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।

সমাজে মানুষের নৈতিক অধঃপতনের চিত্র উঠে এসেছে এ উপন্যাসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েও মদ্যপান আর নারীর শারীরিক সৌন্দর্যে মোহিত তায়েবউদ্দিনের নৈতিক অধঃপতনকেই চিহ্নিত করে। এছাড়া শামারোখের জীবন-যাপনের অনৈতিকতার ইঙ্গিতও লেখক তুলে ধরেছেন। ক্যামব্রিজে পড়তে গিয়ে সোলায়মান চৌধুরীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তার। দেশে এসে তাদের বিয়ে হওয়ার কথা থাকলেও সোলায়মান চৌধুরী অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করে ফেলে। নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের ভাঙনের জন্য সমাজব্যবস্থাই দায়ী। অস্থির সময়ে বসবাস করে মানুষের দাম্পত্য সম্পর্কে ভাঙন ধরে। শামারোখ তার সন্তানকে স্বামীর কাছে রেখে অন্য পুরুষকে বিয়ে করার চিন্তা করে। কিন্তু এর বিপরীত চিত্রও দেখিয়েছেন লেখক। দিলদার সাহেব অর্থবিত্ত ত্যাগ করে একটু সুখের জন্য, ভালোবাসার জন্য দ্বিতীয় স্ত্রী ডেইজীকে নিয়ে টিনের চালের ঘরে বসবাস করেন। এত অভাব সত্ত্বেও তাদের ভালোবাসার কমতি নেই।

ক্ষমতার মোহে মানুষ কীভাবে স্বার্থপর হয়ে ওঠে তা জাহিদের চোখে ধরা পড়ে। শামারোখ চাকুরি পেয়েই ড. শরিফুল ইসলামের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে, অথচ এ ব্যক্তিই একসময় তার চাকুরিতে বাধা দিয়েছিল। এসব বিষয় জাহিদের মনে আঘাত সৃষ্টি করে। আপসহীন ও নির্ভীক স্বভাবের স্পষ্টবাদী জাহিদের পক্ষে এসব মেনে নেওয়া সত্যিই কষ্টকর। কিন্তু বাস্তবতাকে অতিক্রম করার উপায় নেই তারও।

অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী উপন্যাসে 'ঔপন্যাসিকের মধ্যে প্রবল সমাজ-সচেতনতাবোধ ও প্রগতিশীলতা লক্ষণীয়।'[৬৩] দুরদানার সাইকেল চালানোকে লেখকের মনে হয়েছে মুসলিম সমাজের সামন্তযুগীয় অচলায়তনের বিধি নিষেধ ভেঙে নতুন যুগ সৃষ্টির প্রেরণা। ছফা নতুন যুগ সৃষ্টির স্বপ্নে ছিলেন বিভোর। দেশের জন্য, সমাজের জন্য কাজ করার প্রেরণাতেই তিনি বামপন্থী ও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এই অভিজ্ঞতা তিনি উপন্যাসে প্রকাশ করেছেন। দুরদানার ভাই ইউনুস জোয়ারদার সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি করে। সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি করার অপরাধে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক কর্মীদের ওপর তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল নির্যাতন চালিয়েছে, দুরদানার ভাইকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ পিছু নিয়েছে। এমনকি দুরদানার সঙ্গে জাহিদের বন্ধুত্ব থাকায় জাহিদের পেছনেও সক্রিয় থাকে পুলিশের চর। রাজনীতির বেড়াজালে বন্দি হুমায়ুন খুন হয়, লোকে বলে সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতা ইউনুস জোয়ারদারই তাকে খুন করিয়েছে। ক্ষমতা আর রাজনৈতিক বিদ্বেষের কারণে মানুষ খুন করা এদেশীয় রাজনৈতিক জটিলতার ফল। এ ধারাবাহিকতা ইতিহাসের কালক্রমেই চলে আসছে। ইউনুস জোয়ারদারের মৃত্যুর এক বছর যেতে না যেতেই শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে আততায়ীদের হাতে খুন হন। লেখক বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির হতাশার কথা সরাসরি প্রকাশ করেছেন :

> হুমায়ুন জোয়ারদারকে খুন করতে চাইলে, জোয়ারদার হুমায়ুনকে খুন করে বদলা নিলেন। শেখ মুজিব জোয়ারদারকে হত্যা করলেন। সেনাবাহিনীর জওয়ানরা শেখকে খুন করল। জিয়া, তাহের, খালেদ মোশাররফ, মঞ্জুর — কাকে আর হত্যাকারী বলব? আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, মহাকালের খাঁড়ার আঘাতে তাঁদের একেকজনের মুণ্ডু ভাদুরে তালের মতো গড়িয়ে পড়ল। আমি কাকে কার বিরুদ্ধে অপরাধী বলে শনাক্ত করব? এঁরা সবাই দেশপ্রেমিক, সবাই স্বাধীনতা সংগ্রামী। জননী স্বাধীনতা মহাকালের রূপ ধরে আপন সন্তানের মুণ্ডু নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলতে আরম্ভ করেছে। প্রিয় সোহিনী, কার অপরাধ একথা জিজ্ঞেস করবে না। আমরা সবাই শরীরের রক্ত প্রবাহের মধ্যে ঐতিহাসিক পাপের জীবাণু বয়ে বেড়াচ্ছি। সেই ইতিহাস প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। আমরা কেমন যুগে, কেমন দেশে জন্মগ্রহণ করেছি, ভাবো একবার![৬৪]

এ ভ্রান্ত যুগে মানুষের মাঝে সহিষ্ণুতা, মমতা, সততার মতো মানবিক গুণাবলির উপস্থিতি নেই বললেই চলে। ব্যক্তির আত্মিক সংকট এযুগে কতটা তীব্র আকার ধারণ করেছে তা জাহিদের জীবন থেকে জানা যায়। দুরদানাকে তার ভালো লেগেছে কিন্তু পারিপার্শ্বিক চাপ তাকে বাধ্য করেছে দুরদানাকে ছেড়ে আসতে। অপরদিকে শামারোখকে প্রথম দর্শনে ভালোলেগেছিল জাহিদের। অথচ দুজনের মানসিকতা ও সামাজিক অবস্থানের ব্যবধান এত যে মিলন সম্ভব হয়নি। নিজের অজান্তেই জাহিদ জড়িয়ে গিয়েছে এই দুই নারীর জীবনের সঙ্গে। শামারোখের

উগ্র আচরণ আর স্বার্থপরতা জাহিদের ভালো লাগেনি আবার দুরদানার ভালোবাসা, সৌন্দর্য ও মমতা তাকে মুগ্ধ করেছে। প্রচলিত সমাজের ধ্যান-ধারণার সাথে জাহিদের চিন্তার সাযুজ্য নেই বলেই প্রতি পদক্ষেপে তাকে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। ফলে আত্মিক সংকট হয়েছে প্রকট। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষকের আচরণ তার ভালো না লাগলেও তাকে সে পরিবেশেই বসবাস করতে হয়। প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে যেতে হয় তার মনের বিরুদ্ধে। রিসার্চ ফেলো হিসেবে যে টাকা বরাদ্দ তা পেতে তাকে ছুটে যেতে হয় সেই সব শিক্ষকের কাছে। ব্যক্তির এ আত্মিক দ্বন্দ্ব সমাজজীবনের সংকটকেই প্রকাশ করে।

সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতির মেলবন্ধন ঔপন্যাসিক আহমদ ছফার প্রকৃত অন্বিষ্ট। সাহিত্যকে কখনোই তিনি কার্যকারণবিহীন-স্বয়ম্ভূ কোনো কর্ম বলে মনে করতেন না। বরং সাহিত্যের বিশ্লেষণে যে একটি জঙ্গম সমাজ ও তার নানা রূপ উদ্ভাসিত হতে পারে বারংবার তিনি তা দেখিয়েছেন। একটি বিকশিত সমাজের সংস্কৃতি, রাজনীতি তথা অর্থনীতি ও জীবন যাপনের মধ্যে যে অভিন্ন সামঞ্জস্য থাকে তা ছফার উপন্যাসসমূহে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান, সাম্প্রদায়িকতা, শোষণ-অবিচার, নারীর অসহায়ত্ব, নৈতিক অধঃপতন, মানবিক শূন্যতা প্রভৃতির বাস্তব আলেখ্য তাঁর উপন্যাসসমূহ। শিল্পবোধের ছোঁয়ায় এই আলেখ্য হয়ে উঠেছে এদেশীয় জনগোষ্ঠীর জীবনভাষ্য। হাসান আজিজুল হকের মতে :

> কথাসাহিত্যিকের কাজ তাই যাদুর কাঠি বুলিয়ে বাস্তবকে ভুলিয়ে দেওয়া হতে পারে না — বরং তাঁর পালন করা উচিত শল্যচিকিৎসকের নিষ্ঠুর নিস্পৃহ ভূমিকা। সমকালীন জীবনের বাস্তবতার ছবি আঁকাই নয় শুধু, এমনকি সামগ্রিক ছবি দেওয়াও নয়, তাঁর কাজ সমকালীন জীবনকে আমূল কেটে কেটে বিশ্লেষণ করে দেখানো, সবক'টি স্তর, সব রকম আঁশ, তার গভীরতম স্বরূপ, জীবনের সমস্ত তন্তু আলাদা করে ফেলা এবং একেবারে চোখের সামনে আনা।[৬৫]

আহমদ ছফা এদিক থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সমকালীন জীবনের বাস্তবতায় সমাজের সকল স্তরের মানুষ, তাদের জীবন সংগ্রাম, ক্লেদ-বিদ্বেষ, হীনতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির গভীরতম স্বরূপ উন্মোচন করেছেন উপন্যাসে। তাই আহমদ ছফার উপন্যাস হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের দর্পণস্বরূপ।

তথ্যনির্দেশ

১. সুমিতা চক্রবর্তী, "উপন্যাসের গতিরেখা : পূর্ব বাংলা থেকে" শীর্ষক প্রবন্ধ, *উপন্যাস বহুরূপে*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, অক্টোবর ২০১০, পৃ. ১৫৬

২. আহমদ ছফা, *আহমদ ছফা বললেন ... সাক্ষাৎকার পুস্তক*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৭০

৩. প্রাগুক্ত।

৪. নাছির আলী মামুন, *আহমদ ছফার সময়*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৫১

৫. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৭, পৃ. ১২৮

৬. আহমদ ছফা, 'সূর্য তুমি সাথী', *উপন্যাস সমগ্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ১৯

৭. প্রাগুক্ত।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
১১. আহমদ ছফা, *আহমদ ছফা বললেন ... সাক্ষাৎকার পুস্তক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
১২. আহমদ ছফা, 'সূর্য তুমি সাথী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
১৬. রহমান হাবীব, *বাংলাদেশের কবিতা ও উপন্যাসের দর্শন এবং আহমদ ছফার সৃষ্টিবিশ্ব*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৭৯
১৭. আহমদ ছফা, *আহমদ ছফা বললেন ... সাক্ষাৎকার পুস্তক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
১৮. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *দ্বি-জাতিতত্ত্বের সত্য-মিথ্যা*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১১-১২
১৯. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২৪
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮
২২. ম. ইনামুল হক, *বৃহত্তর বাংলার ইতিহাস পরিচয়*, অনুশীলন প্রকাশনী, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৩, পৃ. ১৬৯-১৭০
২৩. আহমদ ছফা, 'ওঙ্কার', *উপন্যাস সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
২৮. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, "আহমদ ছফার উপন্যাস : ব্যঞ্জনাময় প্রতীকে সেদিনের বাংলাদেশে", *আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ*, মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৩৪২
২৯. আহমদ ছফা, 'একজন আলি কেনানের উত্থান পতন', *উপন্যাস সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩
৩১. মহীবুল আজিজ, "আহমদ ছফা : তাঁর সাহিত্যিক অনুসন্ধিৎসা", *আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩
৩২. আহমদ ছফা, 'একজন আলি কেনানের উত্থান পতন', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৪
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫
৩৭. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-২৪০
৩৮. আহমদ ছফা, 'একজন আলি কেনানের উত্থান পতন', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬
৩৯. আহমদ ছফা, 'মরণ বিলাস', *উপন্যাস সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩
৪০. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *আহমদ ছফার পাঁচটি উপন্যাস*, ভূমিকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ফাল্গুন ১৪০১, পৃ. ০৪
৪১. আহমদ ছফা, 'মরণ বিলাস', *উপন্যাস সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২
৪৩. শাওয়াল খান, "কালের কলকাকলি একটি মরণ বিলাস : আহমদ ছফার আবিষ্কার", *আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫
৪৪. আহমদ ছফা, 'অলাতচক্র', *উপন্যাস সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫
৪৫. আমিনুর রহমান সুলতান, *বাংলাদেশের কবিতা ও উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, আগস্ট ১৯৯৬, পৃ. ১৩৭
৪৬. আহমদ ছফা, 'অলাতচক্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০
৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩
৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯
৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮
৫২. প্রাগুক্ত।
৫৩. অশীন দাশগুপ্ত, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২৮
৫৪. আহমদ ছফা, 'অলাতচক্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১
৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫
৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬
৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
৫৮. আহমদ ছফা, *আহমদ ছফা বললেন ... সাক্ষাৎকার পুস্তক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
৫৯. আহমদ ছফা, 'গাভী বিত্তান্ত', *উপন্যাস সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২
৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩
৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫
৬২. আহমদ ছফা, *আহমদ ছফা বললেন ... সাক্ষাৎকার পুস্তক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
৬৩. রহমান হাবীব, *বাংলাদেশের কবিতা ও উপন্যাসের দর্শন এবং আহমদ ছফার সৃষ্টিবিশ্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
৬৪. আহমদ ছফা, 'অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী', *উপন্যাস সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৪-৫৭৫
৬৫. হাসান আজিজুল হক, *কথাসাহিত্যের কথকতা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৫১